POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ؕ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন কিছুর ইবাদত করিতেছ যাহা না তোমাদের অনিষ্ট করিতে পারে, না কোন উপকার, এবং আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

(আল মায়েদা: ৭৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 27

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 4 July, 2024 27 জুল হজ্জ1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

১২৩৭) হযরত আবু যার (গাফফারী) রাজিআল্লাহু তা'লা আনহু-র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: আমার প্রভু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন আগমণকারী আমার কাছে এসে আমাকে বলল।' তিনি বলেন- সে আমাকে সুসংবাদ দিল যে, আমার উম্মতের মধ্য থেকে যে ব্যক্তির মৃত্যু এমন অবস্থায় হবে যে কি না আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে কাউকে শরিক করে না, সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।

১২৩৮) হযরত আব্দুল্লাহ্ (বিন মাসউদ) রাজিআল্লাহু আনহু-র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে শরিক করা অবস্থা মৃত্যু বরণ করবে সে আগুনে প্রবেশ করবে আর আমি (অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ) বলছি, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা যাবে যে কি না আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে কাউকে শরিক করে না, এমন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।

১২৩৯) হযরত বারাআ (বিন আযিব) রাজিআল্লাহ্ আনহু-র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রসুলুল্লাহ্ (সা.) সাতটি বিষয় করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন জানাযায় যেতে, অসুস্থদের খোঁজখবর নিতে, আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে, অত্যাচারিতকে সাহায্য করতে, কসম পূর্ণ করতে, সালামের উত্তর দিতে এবং কেউ হাঁচি দিলে তার জন্য দোয়া করতে। অপরদিকে তিনি রূপার পাত্র (ব্যবহার), সোনার আংটি, রেশমী কাপড় এবং 'দিবাজ', 'কুসি' এবং 'ইসতেবরাক' (বস্ত্র) পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

(সহী বুখারী,কিতাবুল জানায়েয)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৩১ শে মে ২০২৪
হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্নোত্তর।

খোদা তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করে পাঠিয়েছেন যাতে মুসলমানদের মধ্যে তৈরী হওয়া অভ্যন্তরীণ ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করি এবং ইসলামের সত্যতা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরি আর বাহ্যিকভাবে যে সব আপত্তি ইসলামের বিষয়ে করা হয়ে থাকে সেগুলির উত্তর দিই ।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমণের উদ্দেশ্য

হযরত ঈসা (আ.) এর ক্রুশ থেকে জীবিত নেমে আসা এবং সেই ঘটনায় প্রাণ রক্ষা পাওয়ার বিষয়ে কুরআন শরীফে সুনিশ্চিত জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরিতাপ! বিগত এক হাজার বছরে যেখানে ইসলামের উপর বহু বিপদাপদ আপতিত হয়েছে, সেখানে এই বিষয়টিও অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত মুসলমানদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে পড়েছে যে হযরত মসীহকে জীবিত আকাশে উত্তোলন করা হয়েছে, যিনি কিয়ামতের কাছাকাছি সময় আকাশ থেকে নেমে আসবেন। কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীতে খোদা তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করে পাঠিয়েছেন যাতে মুসলমানদের মধ্যে তৈরী হওয়া অভ্যন্তরীণ ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করি এবং ইসলামের সত্যতা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরি আর বাহ্যিকভাবে যে সব আপত্তি ইসলামের বিষয়ে করা হয়ে থাকে সেগুলির উত্তর দিই আর অন্যান্য মিথ্যা ধর্মের বাস্তবতা প্রকাশ করে দিই। বিশেষ করে ক্রুশীয় ধর্মের। অর্থাৎ খৃষ্ট ধর্মের। অর্থাৎ তাদের ভ্রান্ত মতবাদের যেন মুলোৎপাটন করি যা মানুষের জন্য বিপদজ্জনক ও ক্ষতিকারক আর মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের বিকাশের পথে অন্তরায়।

হযরত ঈসা (আ.) এর প্রকৃত সত্য

তাদের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে একটি হল মসীহ্‌র আকাশে আরোহণ করা, দুর্ভাগ্যবশত মুসলমানেরাও তাদের এই মতবাদের সমর্থনে সরব হয়েছে। এই একটি মতবাদের উপরই খৃষ্টবাদের ভিত দাঁড়িয়ে আছে। কেননা খৃষ্টবাদে এই ক্রুশের উপরই নির্ভর করছে তাদের মুক্তি। তাদের বিশ্বাস, মসীহ তাদের জন্য ক্রুশীয় মৃত্যুকে স্বীকার করেছেন অতঃপর তিনি জীবিত হয়ে আকাশে চলে গিয়েছেন; এটিই তাঁর ঈশ্বরত্বের প্রমাণ।

যে সব মুসলমানেরা ভুলবশত তাদের সঙ্গ দিয়েছে, তারা যদিও একথা বিশ্বাস করে না যে তিনি ক্রুশে মারা গিয়েছেন, কিন্তু এতটুকু অবশ্যই বিশ্বাস করেন যে তাঁকে আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে সত্য আল্লাহ্ তা'লা আমার নিকট প্রকাশ করেছেন তা এই যে, মরিয়ম পুত্র ঈসা তৎকালীন ইহুদীদের হাতে চরম নির্যাতিত হয়েছেন। যেভাবে একজন সত্যবাদীকে তাঁর যুগে নির্বোধ বিরুদ্ধবাদীদের হাতে নির্যাতিত হতে হয়। অবশেষে সেই ইহুদীরা ষড়যন্ত্র ও দুষ্কর্মের মাধ্যমে তাঁকে হত্যা করার এবং ক্রুশে দেওয়ার চেষ্টা করে। বাহ্যত তারা নিজেদের পরিকল্পনায় সফল হয়েছিল, কেননা, হযরত মসীহ ইবনে মরিয়ম ক্রুশে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যিনি তাঁর সত্যবাদী ও প্রত্যাদিষ্টদেরকে কখনও বিনষ্ট করেন না, তিনি তাঁর প্রাণ রক্ষা করলেন। তিনি তাঁকে ক্রুশীয় অভিশপ্ত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন এবং এমন নিমিত্ত তৈরী করলেন যার দ্বারা হযরত ঈসা সেই ক্রুশ থেকে জীবিত নেমে এলেন। এ বিষয়টি প্রমাণের জন্য ইঞ্জিলেই বহু দলিল পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে সে সব আমি বর্ণনা করতে চাই না। ইঞ্জিলে বর্ণিত ক্রুশের ঘটনা পড়লে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে হযরত মরিয়ম পুত্র ঈসা ক্রুশ থেকে জীবিত নেমে এসেছিলেন। যেহেতু সেদেশে তাঁর বহু শত্রু ছিল, যারা তার প্রাণের শত্রু, যেমনটি তিনি পূর্বে উল্লেখ করেছেন- নবী কোথাও লাঞ্ছিত হয় না, কিন্তু তার মাতৃভূমিতে- এটি তাঁর দেশত্যাগের দিকে ইঙ্গিত করে। অতঃপর একথা চিন্তা করে তিনি দেশান্তরিত হতে মনঃস্থির করেন এবং তাঁর উপর ন্যস্ত নবুয়তের কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে তিনি বানী ইসরাইলের হারানো মেষপালের সন্ধানে বের হয়ে নাসিবান-এর দিক থেকে আফগানিস্তানের পথ ধরে কাশ্মীরে এসে পৌঁছন এবং সেখানে বসবাসকারী বনী ইসরাঈলদের মাঝে তবলীগ করতে থাকেন, তাদের সংশোধন করেন এবং তাদের মাঝেই মৃত্যু বরণ করেন। এটিই সেই সত্য যা আমার নিকট উদ্ঘাটিত হয়েছে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩০৩-৩০৪)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

মৌলিক ধর্মতত্ত্ব ও এর খুঁটিনাটি

আল্লাহ্ তা'লা নিজের জন্য এক বচন,বহুবচন বা নাম-পুরুষের ব্যবহার করেছেন, এগুলির দ্বারা আল্লাহ্ তা'লা নিজের বিভিন্ন পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট, গুণাবলী ও শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে চেয়েছেন।

কুরআন করীমে অধিকাংশ স্থানে খোদা তা'লার বাণীতে 'আমরা' ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ আমরা এই কাজ করেছি এবং আমরা এই কাজ করব। আর কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এমনটি মনে করে না যে এখানে 'আমরা' বলতে অসংখ্য খোদাকে বোঝানো হয়েছে।

শনিবার রোযা রাখতে এজন্য নিষেধ করা হয়েছে যে, এই দিনটিতে যেহেতু ইহুদীরা রোযা রাখত , তাই ইহুদীদের সঙ্গে মুসলমানদের সাদৃশ্য তৈরী করা থেকে বিরত রাখতে উক্ত দিনে রোযা না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসুল এর আদেশ অমান্য করে নিজের পক্ষ থেকে কোন দিনকে রোযার জন্য নির্দিষ্ট করে নিতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু যে বিশেষ দিনগুলিতে খোদা ও তাঁর রসুল রোযা রাখার অনুমতি দান করেছেন, সেই দিনগুলি যদি জুমআ ও শনিবারের দিন হয় তবে এক্ষেত্রে এই বিশেষ দিনগুলিতে কেবল শুক্র ও শনিবার রোযা রাখলে কোন আপত্তির কিছু নেই।

প্রশ্ন: কানাডা থেকে এক ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেন,' আমরা কলেমা তৈয়্যবা পাঠ করি যার অর্থ আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। কিন্তু কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা নিজের জন্য কখনও 'আমি' কখনও 'আমরা' আবার কখনও 'তিনি' ইত্যাদি ভিন্ন পদ ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা কি?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ১১ই জুলাই ২০২২ তারিখের চিঠিতে লেখেন-

আল্লাহ্ তা'লার জন্য একবচন, বহুবচন বা নাম-পুরুষ ব্যবহৃত হয়েছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি নিজের নিজের মত করে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন 'আমি' হল প্রথম পুরুষ একবচন যার মাধ্যমে একটি সাধারণ আদেশ দেওয়া হয়। আর 'আমরা' হল প্রথম পুরুষ বহুবচন যার মধ্যে পূর্ণ প্রতাপ ও পরাক্রম প্রকাশ করার অভিপ্রেত থাকে। পক্ষান্তরে 'তিনি' হল একবচন নাম=পুরুষ যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার অদৃশ্যমান হওয়া প্রকাশ পায়।

'আমি' এবং 'তিনি' উভয়েই একবচন। প্রথমটি ব্যবহৃত হয় প্রথম পুরুষের জন্য এবং শেষোক্তটি ব্যবহৃত হয় নাম-পুরুষের জন্য। আর সাধারণ অর্থে একজন মানুষও এই দুই পদকে নিজের জন্যই বিভিন্নভাবে বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তা'লা একবচনের এই পদকে নিজের জন্য ব্যবহার করেন তখন তার মধ্যে তাঁর একত্ববাদের বৈশিষ্টের বিশেষ বহিঃপ্রকাশ ঘটানো অভিপ্সীত থাকে। আর 'আমরা' যেহেতু বহুবচন,তাই আল্লাহ্ তা'লা যখন এটিকে নিজের জন্য ব্যবহার করেন তখন তার মধ্যে তাঁর প্রতাপ ও পরাক্রম প্রকাশ করতে চান। যেমন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: খোদা তা'লা যখন একত্ববাদের বিষয়ে বলেন তখন একবচন হিসেবে কিছু বর্ণনা করেন তখন তা মাঝে অনেক ভালবাসা ও স্নেহ থাকে আর একবচন ভালবাসার প্রকাশের স্থানে ব্যবহৃত হয়।বহুবচন খোদা তা'লার রুদ্রমূর্তি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যেখানে তিনি কাউকে শাস্তি দিতে চান।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৫৫)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর রচনা কিতাবুল বারিয়ায় খৃষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদের পক্ষ থেকে দেওয়া যুক্তি খণ্ডন করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'লার জন্য 'আমি ' এবং 'আমরা' পদ ব্যবহার করার বিষয়ে বলেন: 'অতএব, স্পষ্ট থাকে যে, বহুবচন পদ ব্যবহারের আসল উদ্দেশ্য হল খোদা তা'লার শক্তিমত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো আর বিভিন্ন ভাষার অলঙ্কারে এটা ব্যবহৃত হয়। যেমন ইংরেজিতে একজন ব্যক্তিকে 'ইউ' অর্থাৎ তুমি বলে সম্বোধন করা হয়। কিন্তু ত্রিত্ববাদের আকিদা থাকা সত্ত্বেও খোদা তা'লার জন্য সব সময় 'দাও' (Thou) অর্থাৎ তুই' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে হিব্রু ভাষায় 'উদুন', যার অর্থ খোদাওয়ান্দ. উদুনীম ব্যবহৃত হয়েছে। বস্তুত এই অলংকার নিয়ে এই আলোচনা ভাষা সংক্রান্ত। কুরআন করীমে অধিকাংশ স্থানে খোদা তা'লার বাণীতে 'আমরা' ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ আমরা এই কাজ করেছি এবং আমরা এই কাজ করব। আর কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এমনটি মনে করে না যে এখানে 'আমরা' বলতে অসংখ্য খোদাকে বোঝানো হয়েছে।

(কিতাবুল বারিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৩, পৃ: ৯৪-৯৫)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) কুরআন করীমের আয়াত

فَاَوۡحٰۤی اِلَیۡہِمۡ رَبُّہُمۡ لَنُہۡلِکَنَّ الظّٰلِمِیۡنَ ﴿۱۴﴾
وَلَنُسۡکِنَنَّکُمُ الۡاَرۡضَ مِنۡۢ بَعۡدِہِمۡ

অর্থাৎ তখন তাহাদের প্রভু তাহাদের প্রতি ওহী করিলেন, 'আমরা অবশ্যই যালেমদিগকে নিপাত করিব। এবং আমরা তাহাদের পরে তোমাদিগকে অবশ্যই এই দেশে বসবাস করাইব।

(সূরা ইব্রাহিম: আয়াত: ১৪-১৫)

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লার নিজের জন্য বহুবচন পদের ব্যবহারের প্রজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- (এই আয়াতসমূহে) আল্লাহ্ তা'লা নাম-পুরুষ ব্যবহার করেছেন যা বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করে। অথচ বিনাশকারী এবং আশ্রয়দানকারী সত্তা কেবল আল্লাহ্ তা'লাই, যিনি এক-অদ্বিতীয়। এর কারণ এই যে, খোদা তা'লা এখানে নিজেজের প্রতাপ ও পরাক্রম প্রকাশ করতে চান। যেহেতু বহুবচনের শক্তি বেশি, তাই যেখানে কুরআন করীমে স্পষ্টভাবে প্রতাপ ও পরাক্রম দেখানোর উদ্দেশ্য থাকে সেখানে বহুবচন ব্যবহৃত হয়। আর যেখানে অমুখাপেক্ষীতা বোঝাতে চান, কিম্বা প্রতাপ ও পরাক্রম দেখানোর প্রতি ততটা জোর দিতে চান না, সেখানে এক বচন ব্যবহৃত হয়। কোন কোন সুফি এটাও লিখেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা যে কাজ ফিরিশতাদের মাধ্যমে করে থাকেন, সেক্ষেত্রে বহুবচন ব্যবহার করেছেন আর যে কাজ কেবল আদেশের মাধ্যমে করা হয় সেখানে একবচন ব্যবহার করেছেন।

(তফসীর কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৫৫)

অতএব, আল্লাহ্ তা'লা নিজের জন্য এক বচন,বহুবচন বা নাম-পুরুষের ব্যবহার করেছেন, এগুলির দ্বারা আল্লাহ্ তা'লা নিজের বিভিন্ন পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট, গুণাবলী ও শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে চেয়েছেন।

প্রশ্ন: নাইজেরিয়া থেকে জনৈক আহমদী হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কাছে জানতে চেয়েছেন যে, আমরা হাদীসে পড়েছি যে, জুমাআর দিন রোযা রাখতে পারব না। কিন্তু এ বছর আরাফা দিবস জুমআর দিন পড়ছে। সেই দিন কি আমরা রোযা রাখব না?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ৭ই আগস্ট ২০২২ তারিখের চিঠিতে এর উত্তরে লেখেন-

হাদীস থেকে জানা যায় যে, হুযুর (সা.) কেবল জুমআর দিন এবং কেবল শনিবার দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

(সুনান তিরমিযি, কিতাবুস সওম)

হাদীস বিশারদগণ এই বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করেছেন। যেমন- জুমআ যেহেতু ঈদের দিন আর ঈদের দিন খাওয়া দাওয়ার করার দিন হয়ে থাকে তাই ঈদের দিন রোযা রাখা উচিত নয়। অনুরূপভাবে জুমআর দিন রোযা রাখার জন বিশেষ নিষেধাজ্ঞার একটি কারণ হল মুসলমানদেরকে এই দিনটির বাহ্যিক সম্মান দেওয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত রাখা যাতে যেভাবে ইহুদীরা 'সাবাত' বা শনিবারের দিনের সম্মানের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির পরিণামে বিশৃঙ্খলার শিকার হয়েছিল, মুসলমানরাও যেন জুমআর দিন বাহ্যিক সম্মানের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে ফিতনায় নিপতিত না হয়।

(তোহফাতুল আহওয়াজি, শারাহ তিরমিযি, কিতাবুস সওম)

এছাড়াও শনিবার রোযা রাখতে এজন্য নিষেধ করা হয়েছে যে, এই দিনটিতে যেহেতু ইহুদীরা রোযা রাখত , তাই ইহুদীদের সঙ্গে মুসলমানদের সাদৃশ্য তৈরী করা থেকে বিরত রাখতে উক্ত দিনে রোযা না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

(সুনান তিরমিযি, কিতাবুস সওম)

এই সব নির্দেশগুলি ছাড়াও হুযুর (সা.) আরাফা দিবসে (৯ই জিল হজ্জ) এবং 'আশুরা'-দিবস (১০) মহরমের অনেক ফজিলত বর্ণনা করেছেন।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম)

তবে যে ব্যক্তি হজ্জে উপস্থিত থাকে, তার জন্য আরাফার দিনে রোযা রাখা নিষিদ্ধ। (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুস সিয়াম)

সারসংক্ষেপ এই যে, আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসুল এর আদেশ অমান্য করে নিজের পক্ষ থেকে কোন দিনকে রোযার জন্য নির্দিষ্ট করে নিতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু যে বিশেষ দিনগুলিতে খোদা ও তাঁর রসুল রোযা রাখার অনুমতি দান করেছেন, সেই দিনগুলি যদি জুমআ ও শনিবারের দিন হয় তবে এক্ষেত্রে এই বিশেষ দিনগুলিতে কেবল শুক্র ও শনিবার রোযা রাখলে কোন আপত্তির কিছু নেই।

অতএব, আরাফা ও আশুরা- এই দিনগুলিতেই আঁ হযরত (সা.) নফল রোযা রাখার ফজিলত বর্ণনা করেছেন। এই জন্য এই দিনগুলিতে কেবল শুক্রবার বা শনিবারের দিন

এরপর ৯ পাতায়.....

জুমআর খুতবা

হযরত খুবায়েব (রা.) প্রথম সাহাবী ছিলেন; যাকে কাষ্ঠদন্ডে বেঁধে শহীদ করা হয়

হযরত খুবায়েব (রা.) প্রথম সাহাবী ছিলেন, যিনি শহীদ হওয়ার আগে দুই রাকাত নফল পড়ার রীতি প্রচলন করেন।

আল্লাহ্ তা'লা এভাবেও নিজ প্রিয়দের সুরক্ষা করেন। বহু এমন উপলক্ষ্য রয়েছে যখন লাশকে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে।

হযরত খুবায়েব (রা.) এর শাহাদতের ঈমান উদ্দীপক ঘটনা এবং ফিলিস্তিন, সুদান, ইয়েমেন এবং পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান

মাননী চৌধুরী মুনীর আহমদ সাহেব (মুরুব্বী সিলসিলা, যুক্তরাষ্ট্র) , ডাইরেক্টর মসরুর টেলিপোর্ট (এম.টি.এ ইন্টারন্যাশন্যাল, ইউ.এস) এবং মাননীয় আব্দুর রহমান কুট্টী সাহেব (কেরালা) এর স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৩১শে মে, ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (৩১ শে হিজরত, ১৪০৩ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, একটি সেনাভিযানের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত খুবায়েব (রা.)-র শাহাদত সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছিল। এর আরও বিশদ বিবরণে লেখা আছে, তিনি প্রথম সাহাবী ছিলেন; যাকে কাষ্ঠদন্ডে বেঁধে শহীদ করা হয় অর্থাৎ ক্রুশের মতো ঝুলিয়ে শহীদ করা হয়েছে। আল্লামা ইবনে আসীর জাযরী লিখেন, হযরত খুবায়েব (রা.) প্রথম সাহাবী ছিলেন, যাকে আল্লাহ্র খাতিরে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। (উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড,পৃ: ১৫৬)

একটি রেওয়ায়েতে আছে, কুরাইশরা হযরত খুবায়েব (রা.)-কে বলেন, তুমি যদি ইসলাম (ধর্ম) ত্যাগ করো তাহলে আমরা তোমার রাস্তা ছেড়ে দিবো। কিন্তু যদি তুমি পরিত্যাগ না করো তাহলে আমরা তোমাকে হত্যা করব।

হযরত খুবায়েব (রা.) বলেন, আল্লাহ্র রাস্তায় আমাকে হত্যা করা তো একটি তুচ্ছ বিষয়। এরপর বলেন, "হে আল্লাহ্! এখানে এমন কেউ নেই যে তোমার রসূল (সা.)-এর কাছে আমার সালাম পৌঁছে দিবে। তাই হে খোদা! তুমি স্বয়ং মহানবী (সা.)-কে আমার সালাম পৌঁছে দাও আর এখানে আমাদের সাথে যা ঘটছে তা তাঁকে জানিয়ে দাও।"

(সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩৫)

হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, "একদিন মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের সাথে বসে ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর ওপর তখন ঠিক তদ্রুপ অবস্থা সৃষ্টি হয় যেমনটি ওহী অবতরণের সময় হতো। আমরা তাঁকে (সা.) বলতে শুনি, 'ওয়া আলাইহিস্ সালামু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'। অর্থাৎ তার প্রতিও শান্তি, আল্লাহ্র আশিস ও কল্যাণরাজি বর্ষিত হোক।" এরপর যখন মহানবী (সা.)-এর ওপর থেকে ওহীর প্রভাব দূর হয়ে যায় তখন তিনি (সা.) বলেন, ইনি ছিলেন জীব্রাঈল, তিনি আমাকে খুবায়েবের সালাম পৌঁছাচ্ছিলেন। খুবায়েবকে কুরাইশরা হত্যা করেছে।

রেওয়ায়েত আছে, হযরত খুবায়েব (রা.)-র মৃত্যুর সময় কুরাইশরা এমন চল্লিশজন মানুষকে ডেকেছিল যাদের পিতৃপুরুষরা বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। এরপর কুরাইশরা তাদের মধ্য হতে প্রত্যেককে একটি করে বর্শা দিয়ে বলে, এ হলো সেই ব্যক্তি যে তোমাদের বাপ-দাদাকে হত্যা করেছিল।

(সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩৬)

তখন তারা নিজেদের বর্শা দ্বারা খুবায়েব (রা.)-কে হালকা ভাবে আঘাত করতে থাকে। যার ফলে হযরত খুবায়েব (রা.) ক্রুশে কষ্ট পেতে থাকেন। এরপর খুবায়েব (রা.) ঘুরলে তার চেহারা কাবামুখি হয়ে যায়। তিনি (রা.) বলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমার মুখমণ্ডল তাঁর পছন্দকৃত কিবলামুখি করেছেন। এরপর মুশরিকরা খুবায়েব (রা.)-কে হত্যা করে।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪৪)

এথেকে বুঝা যায়, মুশরিকরা প্রথমে হযরত খুবায়েব (রা.)-কে বর্শাবিদ্ধ করে, চরম কষ্ট দেয় তারপর হত্যা করে। যদিও বুখারীর একটি রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, হযরত খুবায়েব (রা.) যখন তার পঙক্তি (পাঠ) শেষ করেন তখন উকবা বিন হারেস তার কাছে আসে এবং সে হযরত খুবায়েব (রা.)-কে হত্যা করে। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪০৮৬)

উকবা বিন হারেসের ডাক নাম আবু সিরওয়াহ্ বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া কোনো কোনো রেওয়ায়েতে উল্লে খ আছে, আবু সিরওয়াহ্ উকবা বিন হারেস তখন ছোটো ছিল। তার হাতে বর্শা দেওয়া হলেও আঘাত করেছিল আবু মায়সারা আবদারী। অর্থাৎ, প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে বালকের হাতে বর্শা তুলে দেওয়া হলেও তার (রা.) ওপর শক্তি প্রয়োগ করেছিল বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা। কোনো কোনো আলেম আবু সিরওয়াহ্'কে ভিন্ন ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেছেন এবং উকবা বিন হারেসকে তার ভাই বলে লিখেছেন।আবু মায়সারা আঘাত করলে তা কার্যকর প্রমাণিত হয়নি তখন আবু সিরওয়াহ্ এগিয়ে গিয়ে বর্শা দ্বারা তাকে হত্যা করে। পরবতীতে উকবা বিন হারেস, যিনি মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি বর্ণনা করেন; আমি যখন ছোটো ছিলাম তখন আবু মায়সারা আবদারী আমার হাতে বল্লম অথবা বর্শা ধরিয়ে দেয় এবং নিজেই আমার হাতের সাহায্যে খুবায়েবকে হত্যা করে।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.) ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৪৮-১৪৯]

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এ সম্পর্কে লিখেছেন, কুরাইশ নেতাদের হৃদয়ে (লালিত) শত্রুতার কারণে করুণা ও ন্যায়বিচার পাওয়া ছিল প্রশ্নাতীত। অতএব, তখনও বেশি দিন অতিবাহিত হয়নি, বনু হারেস গোত্রের লোকেরা এবং অন্যান্য কুরাইশ নেতারা খুবায়েব (রা.)-কে হত্যা করার জন্য এবং তার হত্যাকাণ্ড উপলক্ষ্যে আনন্দ উদযাপনের উদ্দেশ্যে তাকে একটি খোলা মাঠে নিয়ে যায়। খুবায়েব (রা.) শাহাদত আঁচ করতে পেরে কুরাইশের কাছে অনেক আকুতি-মিনতি করে বলেন, মৃত্যুর পূর্বে আমাকে দু'রাকাত নামায পড়তে দাও। কুরাইশরা সম্ভবত ইসলামী নামাযের দৃশ্যকেও এই উপহাসের অংশ বানাতে চাচ্ছিল (তাই) অনুমতি দিয়ে দেয়। খুবায়েব (রা.) গভীর মনোযোগ ও কায়মনোচিত্তে দু'রাকাত নামায পড়েন। এরপর নামায শেষ করে কুরাইশকে বলেন,

"আমার মন চাচ্ছিল আমি যেন আমার নামাযকে দীর্ঘ করি কিন্তু পরে আমার মনে হলো, পাছে তোমরা আবার কোথাও এটি ভেবে না বসো যে, আমি মৃত্যুকে বিলম্বিত করার জন্য নামায দীর্ঘ করছি।"

এরপর খুবায়েব (রা.) নিম্নোক্ত পঙ্ক্তি পড়তে পড়তে নতজানু হয়ে যান।

وَمَا اَنْ اُبَالِيْ حِيْنَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلٰى اَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِيْ

وَذٰلِكَ فِيْ ذَاتِ الْاِلٰهِ وَ اِنْ يَّشَاءْ يُبَارِكْ عَلٰى اَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

অর্থাৎ, আমি যেহেতু ইসলামের পথে এবং মুসলমান অবস্থায় নিহত হচ্ছি, তাই নিহত হওয়ার পর আমি কোন্ পার্শ্বে পতিত হবো তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। এসব কিছু আল্লাহ্র (সন্তুষ্টির) জন্য, আমার খোদা চাইলে আমার ছিন্নভিন্ন দেহের প্রত্যেকটি অংশে কল্যাণ অবতীর্ণ করবেন। সম্ভবত খুবায়েব (রা.)-র মুখে এসব পঙ্ক্তির শেষ শব্দাবলী উচ্চারিত হচ্ছিল তখন উকবা বিন হারেস এগিয়ে গিয়ে আঘাত করে আর এই রসূল-প্রেমিক মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে, কুরাইশরা খুবায়েব (রা.)-কে একটি গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়েছিল এবং এরপর বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে (তাকে) হত্যা করে।"

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম. এ, পৃ: ৫১৫)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বর্ণনা করেন, 'তাকে হত্যার সময় ঘনিয়ে এলে, খুবায়েব (রা.) বলেন, আমাকে দু'রাকাত নামায পড়তে দাও। কুরাইশরা তার এই অনুরোধ মেনে নেয় এবং খুবায়েব (রা.) সবার সামনে শেষবারের মতো এই পৃথিবীতে নিজ প্রভুর ইবাদত করেন। নামায শেষ করার পর তিনি বলেন, আমি নামায দীর্ঘ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু কোথাও তোমরা আবার এটি মনে না করে বসো যে, আমি মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছিতাই (নামায) শেষ করে দিলাম। এরপর প্রশান্তচিত্তে হন্তারকের সামনে নিজের মাথা পেতে দেন। আর এমনটি করার সময় এই পঙ্ক্তি পাঠ করেন।

وَلَسْتُ اُبَالِيْ حِيْنَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلٰى اَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلّٰهِ مَضْرَعِيْ

وَذٰلِكَ فِيْ ذَاتِ الْاِلٰهِ وَاِنْ يَّشَأْ يُبَارِكْ عَلٰى اَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ

অর্থাৎ আমি যেহেতু মুসলমান অবস্থায় মারা যাচ্ছি তাই নিহত হয়ে আমি কোন্ পাশে পতিত হবো তাতে আমার কোনো ভ্রুক্ষেপ নাই। এসব কিছু আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টির) খাতিরে, আর আমার আল্লাহ্ চাইলে আমার দেহের খণ্ড বিখণ্ড টুকরোতেও কল্যাণ অবতীর্ণ করবেন। খুবায়েব (রা.)-র উক্ত পঙ্ক্তি পাঠ শেষ করার পূর্বেই জল্লাদের তরবারি তার ঘাড়ে আঘাত হানে আর তার মস্তক মাটিতে লুটিয়ে পড়ে । "

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২৬২)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হযরত খুবায়েব (রা.) প্রথম ব্যক্তি ছিলেন, যিনি নিহত হওয়ার পূর্বে দু'রাকাত নামায পড়ার রীতি প্রচলন করেছিলেন।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪০৮৬)

বিরোধীদের সম্পর্কে হযরত খুবায়েব (রা.)-র (একটি) দোয়া (ছিল) আর সেই দোয়ার ফলশ্রুতিতে তাদের পরিণাম কী হয়েছিল- এ সম্পর্কে লিখিত আছে, আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী, যিনি বুখারী শরীফের ভাষ্যকার, তিনি রাজী-র সেনাভিযানের অধীনে একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন, খুবায়েব (রা.) শাহাদতের সময় এই দোয়া করেন যে, আল্লাহুম্মা আহসেহিম আদাদা। অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্! এই শত্রুদের সংখ্যা গণনা করে রাখো। অর্থাৎ আমার এই শত্রুদের সংখ্যা গণনা করে রাখো যেন তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারো। এছাড়া অপর এক রেওয়ায়েতে এই শব্দগুলো অতিরিক্ত রয়েছে যে, ওয়াকতুলহুম বাদাদান ওয়ালা তুবকে মিনহুম আহাদা। অর্থাৎ আর তাদের বেঁছে বেঁছে হত্যা করো এবং তাদের মধ্য থেকে কোনো একজনকেও ছেড়ে দিও না।

যখন হযরত খুবায়েব (রা.) নিহত হওয়ার জন্য কাষ্ঠদন্ডে উঠেন তখন তিনি এই দোয়া করেছিলেন, একজন মুশরিক যখন এই দোয়া শোনে যে, আল্লাহুম্মা আহসেহিম আদাদান ওয়াকতুলহুম বাদাদা। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তাদের সংখ্যা গুণে রাখো। আর তাদেরকে বেঁছে বেঁছে হত্যা করো। তখন সে ভয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। বলা হয়, এর এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই মাটিতে লুটিয়ে পড়া ব্যক্তি ছাড়া হযরত খুবায়েব (রা.)-র হত্যাকাণ্ডে জড়িত আর কেউ বেঁচে ছিল না, সবাই মারা যায়।

(ফাতহুল বারি, শারাহ সহীহ বুখারী, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪৪৩)

যাইহোক, যদিও এটি কোথাও প্রমাণিত নয়, অন্য কোথাও এটি পাওয়া যায় না যে, এক বছর পার হওয়ার আগেই সবাই মারা গিয়েছিল। তবে, এটি বলা যেতে পারে যে, তাদের অধিকাংশই নিহত হয়। হয় তারা নিহত হয় কিংবা মক্কা বিজয় পর্যন্ত প্রায় সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। আর এভাবে হযরত খুবায়েব (রা.)-র দোয়া পুরো মহিমার সাথে পূর্ণ হয় যে, তাদের কতিপয় জাহান্নামে যায় আর বাকিরা ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করে।

একজন জীবনীকার এই প্রেক্ষিতে লিখেন, মুশরিকরা খুবায়েব (রা.)-র মুখে এসব বাক্য শুনে কেঁপে উঠে। তাদের বিশ্বাস ছিল, খুবায়েব (রা.)-র এই বদদোয়া বৃথা যাবে না। হারেস বিন বারসা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি তখনও মুসলমান হননি। তার ভাষ্য হলো, খুবায়েব (রা.)-র বদদোয়া শোনামাত্রই আমার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে, এই বদদোয়া তাদের মধ্য থেকে কাউকে জীবিত রাখবে না। এ কারণেই উক্ত বদদোয়া শুনে সেখানে উপস্থিত কাফির ও মুশরিকদের মধ্য থেকে কেউ কেউ কানে আঙুল গুঁজে দিয়ে পলায়ন করে। কেউ কেউ মানুষজনের পেছনে লুকাতে থাকে, অর্থাৎ বদদোয়ার প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের প্রথা অনুযায়ী একে অপরের পেছনে লুকাতে থাকে। কেউ কেউ গাছের আড়ালে চলে যায়। আবার কেউ কেউ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তাদের ধারণা ছিল, এভাবে আমরা এই বদদোয়ার (প্রকোপ) থেকে নিরাপদ থাকব। তাদের মাঝে প্রথাগতভাবে একথা প্রসিদ্ধ ছিল যে, যদি কারও জন্য বদদোয়া করা হয় আর সে একপাশে ফিরে শুয়ে পড়ে তাহলে সেই বদদোয়ার প্রভাব শেষ হয়ে যায়।

হযরত মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান নিজের এবং তার পিতার ইসলাম গ্রহণের পূর্বের ঘটনা বর্ণনা করেন যে, অন্য লোকদের মতো আমিও আমার পিতার সাথে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি লক্ষ্য করি, খুবায়েব (রা.)-র বদদোয়া শুনে আমার পিতা বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি আমাকে শোয়ানোর জন্য এত জোরে মাটির দিকে টান দেন যে, আমি চিৎ হয়ে পড়ে যাই। পড়ে যাওয়ার কারণে আমার এমন প্রচণ্ড আঘাত লাগে যে, আমি দীর্ঘদিন তার কষ্ট অনুভব করতে থাকি। হুআয়তেব বিন আব্দুল উযযা মক্কা বিজয়ের বছর মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি বলেন, হযরত খুবায়েব এর বদদোয়া শুনতেই আমি তৎক্ষণাৎ কানে আঙুল দিই আর পলায়ন করি। আমার ভয় ছিল যে, তার বদদোয়ার আওয়াজ কোথাও আমার কানের পশ্চাদ্ধাবন না করে। হাকীম বিন হিযাম বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত খুবায়েবএর বদদোয়ার ভয়ে গাছের পেছনে লুকিয়ে পড়ি। জুবায়ের বিন মুতয়েম বলেন, আমি সেদিন হযরত খুবায়েবএর বদদোয়ার মুখোমুখি হওয়ার সাহস করে উঠতে পারিনি। আমি ত্রস্ত হয়ে মানুষের আড়াল গ্রহণ করি। নওফেল বিন মুআবিয়া দিলি মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হন। তিনি বলেন, সেদিন আমি খুবায়েব -এর বদদোয়ার সময় উপস্থিত ছিলাম। আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, তার বদদোয়ার ফলে সেখানে উপস্থিত লোকদের মাঝে কেউ জীবিত থাকবে না। আমি দাঁড়ানো ছিলাম। তার বদদোয়ায় ভয় পেয়ে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ি। কুরাইশ গোত্রের লোকদের মাঝে এই বদদোয়ার অনেক চর্চা হতে থাকে। এক মাস বা এর অধিক কাল পর্যন্ত তাদের সভাসমূহে খুবায়েব এর বদদোয়ার ভীতি ছেয়ে থাকে আর তারা এ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার সমালোচনা করতে থাকে। (সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড,পৃ: ৪৭০-৪৭১)

অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, উক্ত জমায়েতে এক ব্যক্তি সাঈদ বিন আমেরও যোগ দিয়েছিল। এই ব্যক্তি পরবতীতে মুসলমান হয়ে যায়। আর হযরত উমর এর খিলাফতকাল পর্যন্ত তার অবস্থা এই ছিল যে, যখনই হযরত খুবায়েব-এর ঘটনা তার স্মরণ হতো তখনই সে অচেতন হয়ে পড়ত।" (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫১৫-৫১৬)

সাঈদ বিন আমের, অর্থাৎ এখনই যার উল্লেখ হয়েছে, তার সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর নিজ খিলাফতকালে তাকে সিরিয়ায় এক স্থানে আমলা হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। আর কখনো কখনো তিনি মানুষের সামনেই হঠাৎ অচেতন হয়ে পড়তেন। মানুষ হযরত উমরের কাছে অভিযোগ করে যে, যাকে আপনি আমাদের ওপর আমলা নিযুক্ত করেছেন তিনি তো অসুস্থ ব্যক্তি। একবার তিনি যখন হযরত উমরের সাথে সাক্ষাতের জন্য আসেন তখন হযরত উমর তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, হে সাঈদ! তোমার কোনো অসুস্থতা আছে কি? তখন তিনি নিবেদন করেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার কোনো ধরনের কোনো অসুস্থতা নেই। কথা কেবল এতটুকু যে, হযরত খুবায়েবকে যখন হত্যা করা হচ্ছিল তখন সেখানে উপস্থিত লোকদের মাঝে আমিও অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আর এখন যখন হযরত খুবায়েবএর সেই দোয়ার কথা আমার স্মরণ হয় তখন ভয়ে আমি অচেতন হয়ে পড়ি। (আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫০)

মহানবী (সা.)-এর হযরত খুবায়েব-এর মৃতদেহকে ক্রুশ থেকে নামানোর জন্য একটি দলকে প্রেরণ করা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, কুরাইশরা শুলের সুরক্ষার জন্য চল্লিশ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেছিল যেন সেই লাশ সেখানেই ঝুলানো থাকে এবং সেখানেই নষ্ট হয়ে যায় অথবা পচে গলে যায় অথবা তারা পরবতীতে নিজেদের প্রতিশোধ নিতে থাকে। যাহোক মহানবী (সা.) হযরত মিকদাদ এবং হযরত যুবায়ের বিন আওয়ামকে মক্কার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন, যেন তারা হযরত খুবায়েব -এর মৃতদেহকে শুল থেকে নামিয়ে আনেন। তিনি (সা.) এ সম্পর্কে জেনে গিয়েছিলেন। হয়ত আল্লাহ্ তা'লা অবহিত করে থাকবেন। যাহোক এক বর্ণনা অনুযায়ী মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের মাঝে কে আছে যে, খুবায়েবকে শুল থেকে নামিয়ে আনবে, যার ফলে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে। হযরত যুবায়ের বিন আউয়াম নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি এবং আমার সঙ্গী মিকদাদ বিন আসওয়াদ এই কাজ করতে পারব। তারা উভয়ে যখন সেখানে পৌঁছেন যেখানে হযরত খুবায়েব-এর মৃ তদেহ ছিল তখন তারা সেখানে চল্লিশ ব্যক্তিকে পান, কিন্তু তারা সবাই মাতাল অবস্থায় ঘুমিয়ে ছিল। তারা উভয়ে হযরত খুবায়েবকে নামিয়ে আনেন। আর এটি হযরত খুবায়েব-এর শাহাদাতের চল্লিশ দিন পরের ঘটনা। হযরত যুবায়ের হযরত খুবায়েব-এর লাশ নিজ ঘোড়ার ওপর রাখেন আর তারা উভয়ে হাঁটতে থাকেন। এমনকি যখন কাফেররা বুঝতে পারে আর তারা হযরত খুবায়েবকে পায়নি তখন তারা কুরাইশদের এই সংবাদ জানায়, যার ফলে তাদের সত্তর জন আরোহী বের হয়। অর্থাৎ তারা আরও বেশি লোক অন্তর্ভুক্ত করে যেন পিছু ধাওয়া করতে পারে। এরপর যখন কুরাইশ গোত্রের লোকেরা উপরোল্লিখিত উভয় সাহাবীর নিকটে পৌঁছে তখন হযরত যুবায়ের হযরত খুবায়েব-এর লাশকে মাটিতে

রাখেন এবং তিনি নিজের মাথার পাগড়ি খুলে বলেন, আমি যুবায়ের বিন আওয়াম আর ইনি আমার সঙ্গী মিকদাদ বিন আসওয়াদ। আমরা দুজনেই এমন বাঘ যারা নিজেদের সন্তানদের ছেড়ে এসেছি। যদি তোমরা চাও তাহলে আমরা তিরের মাধ্যমে তোমাদের স্বাগত জানাতে পারি। আর যদি চাও তাহলে তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে পারি। অথবা যদি তোমরা চাও তাহলে এখান থেকে ফেরত চলে যাও। এটি শুনে সেই মুশরিকরা ফিরে যায়। এরপর হযরত যুবায়ের ফিরে দেখেন যে, হযরত খুবায়েব-এর লাশ অদৃশ্য হয়ে গেছে, যেন মাটি তাকে গিলে নিয়েছে। এর ফলে তার নাম 'বালিউল আরয' প্রসিদ্ধ হয়ে যায়, অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যাকে মাটি গিলে নিয়েছে। লাশ অদৃশ্য হয়ে যাওয়া সম্পর্কে এমন রেওয়াতসমূহ পাওয়া যায় যেগুলো অদ্ভুত মনে হয়। তথাপি একটি রেওয়াত রয়েছে যা একটু পর বর্ণনা করব, সেটি সঠিক মনে হয় যে, কীভাবে লাশ অদৃশ্য হয়েছে। যাহোক হযরত যুবায়ের ও হযরত মিকদাদ-এর জন্য ফিরিশতাদের গর্ব করার বিষয়ে লিখিত আছে যে, এরপর হযরত যুবায়ের (রা.) ও হযরত মিক দাদ (রা.) মদিনায় আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর কাছে পৌঁছেন; তখন মহানবী (সা.)-এর কাছে হযরত জিবরাঈল ছিলেন। হযরত জিবরাঈল তাঁর কাছে নিবেদন করেন যে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনার সাহাবীদের মাঝে এই দুইজনের জন্য ফিরিশতারাও গর্ব করে।

(সীরাত হালবিয়া, ৩য় খণ্ড,পৃ: ২৩৬) (তারিখুল খামিস, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৪)

সীরাত গ্রন্থসমূহে হযরত খুবায়েব (রা.)-এর লাশ নিয়ে আসার জন্য আরও একটি দল প্রেরণ করারও উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব একটি রেওয়াত অনুসারে মহানবী (সা .) হযরত আমর বিন উমাইয়্যাকে একা গুপ্তচর হিসেবে কুরাইশদের প্রতি প্রে রণ করেন। তিনি বর্ণনা করেন, আমি হযরত খুবায়েব (রা.)-এর ক্রুশের কাছে যাই। আমি গুপ্তচরদের ভয়ে ভীত ছিলাম। আমি ক্রুশে আরোহন করে হযরত খুবায়েব (রা.)-এর লাশটিকে বাঁধনমুক্ত করলে সেটি মাটিতে এসে পড়ে। আমি কিছুক্ষণের জন্য এক পাশে সরে যাই। আমি নিজের পিছনে আওয়াজ শুনতে পাই। এরপর আমি তাকিয়ে দেখি সেখানে হযরত খুবায়েবের (রা.) লাশ নেই, যেন মাটি তাকে গিলে নিয়েছে। আজ পর্যন্ত তার কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪৫)

এতেও অতিরঞ্জন রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। যাহোক এমন রেওয়াতসমূহ ইতিহাসে লিখিত রয়েছে। অপর একটি রেওয়াত অনুসারে হয রত আমর বিন উমাইয়্যা যামরির সাথে হযরত জব্বার বিন সাখার আনসারীকেও পাঠানো হয়েছিল। হযরত খুবায়েব (রা.)-এর লাশের তদারককারী কুরাইশ গোত্রের লোকেরা যখন তাদের উভয়ের পিছু ধাওয়া করে তখন হযরত জব্বার (রা.) লাশটিকে নদীতে ফেলে দেন আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লা হযরত খুবায়েবের লাশকে কাফেরদের কাছ থেকে অদৃশ্য করে দেন।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ: ৮৮৫)

যাহোক আমি যেমনটি বলেছি, এর বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। এই রেওয়ায়েতটি অধিক সঠিক বলে মনে হয় যে, যখন তারা পিছু নেয় তখন তিনি অর্থাৎ হযরত জব্বার (রা.) লাশটিকে নদীতে ফেলে দেন এবং নদী লাশটিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আর এমনটি হয়ে থাকে যে, নদীর স্রোত লাশকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অতএব এই বিষয়ে বিভিন্ন রেওয়াত রয়েছে। যাহোক তার লাশ কাফেরদের হস্তগত হয়নি। আর এটাই বলা হয়েছে যে, মাটি গিলে ফেলেছে বা অদৃশ্য হয়ে গেছে। এ কারণেই তিনি 'বালীউল আরয' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যান, কেননা তার লাশ মাটিতে অদৃশ্য হয়ে যায়। সেই কাফেররা যা করতে চাচ্ছিল তা আর তারা করতে পারেনি। আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লা লাশটিকে অমর্যাদার হাত থেকে রক্ষা করেন।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা এভাবেও নিজ প্রিয়দের সুরক্ষা করেন। বহু এমন উপলক্ষ্য রয়েছে যখন লাশকে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে।

গতবার আমি একটি ঘটনা শুনিয়েছিলাম যেখানে ভীমরুল ও মৌমাছির মাধ্যমে লাশকে সুরক্ষিত রাখা হয়েছিল, লাশের অমর্যাদা করা সম্ভব হয়নি।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৩)

যাহোক এরাই সেসব লোক যারা আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাসতেন এবং আল্লাহ্‌র খাতিরে ত্যাগ স্বীকার করতেন। আর আল্লাহ্ তা'লাও তাদের মূল্যায়ন করতেন এমনকি মৃত্যুর পরেও তাদের লাশকে নিরাপদ রেখেছেন।উক্ত অভিযানের উল্লেখ এখানেই শেষ হচ্ছে।

আমি দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে আসছি। ফিলিস্তিনের অধিবাসীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন। এখন তো সীমা ছাড়িয়ে গেছে। রাফা সম্পর্কে আমেরিকা প্রথমে বলেছিল যে, এটি আমাদের শেষ সীমা হবে। কিন্তু এখন তারা বলছে যে, না, এখনও শেষ হয়নি। জানা নেই, তাদের এই শেষ সীমার মান কী! কত লক্ষ লোককে তারা হত্যা করবে! যার পর তাদের টনক নড়বে। আল্লাহ্ তা'লা এই অত্যাচারীদের হাত থেকে বিশ্ববাসীকে মুক্তি দিন এবং নিরপরাধ ফিলিস্তিনেদেরকেও মুক্ত করুন। অনুরূপভাবে সুদানের অধিবাসীদের জন্য দোয়া করুন। সেখানে তো স্বয়ং তাদের জাতির লোকেরাই নিজেদের জাতির লোকদের হত্যা করছে। মুসলমানরা মুসলমানদেরকে হত্যা করছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও বিবেক দিন। তারা আল্লাহ্ তা'লার পাকড়াও থেকে আত্মরক্ষাকারী হোক এবং মুসলমান হওয়ার দাবি করে তারা যেন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর ওপরও আমলকারী হয়।

ইয়েমেনের বন্দিদের জন্য দোয়া করুন; আল্লাহ্ তা'লা তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করুন।

পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। সেখানেও পরিস্থিতির উত্থান-পতন হতে থাকে। আর যখন কিনা ঈদ সন্নিকটবর্তী, এই সময়ে মৌলবীরা আরও বেশি বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকে সব ধরনের দুষ্কৃতি থেকে সুরক্ষিত রাখুন। দ্রুত বন্দি দের মুক্তিরও ব্যবস্থা করুন।

এখন আমি জুমুআ'র পর গায়েবানা জানাযার নামাযও পড়াব। প্রথম জানাযা হলো, আমাদের মুরব্বীসিলসিলাহ্ চৌধুরী মু নীর আহমদ সাহেবের, যিনি আমেরিকার এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল টেলিপোর্ট-এর পরিচালক ছিলেন। কিছুদিন পূর্বেই তিনি ৭৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, **'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।**

তার বংশে তার প্রপিতামহ হযরত মৌলভী ফযল দীন সাহেব (রা.)-এর মাধ্যমে আহমদীয়াত প্রবেশ করে যার নাম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ৩১৩জন সাহাবীর তালিকায় দুই নম্বরে রয়েছে। চৌধুরী মুনীর সাহেব ১৯৭৮ সালে জামেয়া আহমদীয়া থেকে শাহেদ কোর্স সম্পন্ন করেন। এরপর পাকিস্তানে বিভিন্ন স্থানে মুরব্বী হিসেবে সেবা করেছেন। অতঃপর কেন্দ্রীয় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার মোতামাদ হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৮১ সালে তাকে আমেরিকা প্রেরণ করা হয়। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে ছিলেন। এরপর সেখান থেকে পাকিস্তান ফেরত আসেন। এরপর ১৯৯৪ সালে পুনরায় আমেরিকা চলে যান আর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত আমেরিকাতেই ছিলেন এবং জামা'তের সেবা করতে থাকেন। তিনি আমেরিকার এমটিএ টেলিপোর্ট প্রতিষ্ঠায় অসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন। প্রথমে এটি শুধু সেখান থেকে সম্প্রচার করার একটি ছোটো স্টুডিও ছিল মাত্র। এরপর এটিকে প্রশস্ত করা হয় এবং রীতিমতো উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার জন্য একটি পৃথক বিভাগ খোলা হয় আর আমি তাকে সেখানে এমটিএ-র একজন পরিচালক নিযুক্ত করি। অত্যন্ত পরিশ্রম ও আত্মনিবেদনের সাথে এবং সর্বোচ্চ প্রযুক্তিগত দক্ষতা, যা তিনি অর্জন করেননি; অর্থাৎ জাগতিক জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি অর্জন করেননি বা বিশেষভাবে কোনো ডিগ্রি নিয়ে পড়াশুনা করেননি, কিন্তু নিজের আগ্রহ ছিল এবং এ কাজ করার আগ্রহ ছিল তাই নিজে ইজ্ঞানার্জন করেছেন এবং এই টেলিপোর্টকে তিনি অত্যন্ত সুচারুরূপে পরিচালনা করেছেন আর প্রযুক্তিগতভাবে সবদিক থেকে উন্নত মানে পৌঁছিয়েছেন। তার শোক সন্তপ্ত পরিবারে তার স্ত্রী ছাড়াও এক পুত্র এবং দুই কন্যা রয়েছে। তার সন্তানরা বলেছে যে, তিনি সর্বদা খোদা তা'লার ওপর ভরসা করতেন এবং বিপদের সময় দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। এটিই বলতেন যে, যেসব উপকরণাদি রয়েছে তা ব্যবহার করো আর এরপর বিষয় সর্বদা খোদা তা'লার ওপর ছেড়ে দাও। আতিথেয়তার বৈশিষ্ট্য খুবই উল্লেখযোগ্য ছিল। অতিথিদের জন্য সর্বদা নিজের ঘর খোলা রাখতেন। সন্তানদেরকে সর্বদা খিলাফতের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের তাগিদ দিতেন। যে দক্ষতাই আছে তা এমটিএ-র জন্য সর্বদা কাজে লাগাতেন, বরং তার সন্তানরা বলেছে যে, হাসপাতালেও বিভিন্ন সময় যখন অসুস্থ ছিলেন, বিভিন্ন সময় দীর্ঘদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন, তো হাসপাতালে ভর্তি হলে সেখানেও এমটিএর জন্য কাজ করতে থাকতেন। মোটকথা একজন ওয়াকফে জিন্দেগীর এক উন্নত আদর্শ ছিলেন।

আমেরিকা জামা'তের আমীর মির্যা মাগফুর আহমদ সাহেব লেখেন, তাঁর এক বিশেষ গুণ ছিল, তিনি যে কেবল নিজ বিভাগকে উন্নত করতে পরিশ্রম ও মনোযোগ দিয়ে কাজ করতেন তাই নয় বরং নিজের সময় এবং জ্ঞান জামা'তের অন্যান্য কাজে ব্যয় করতে কখনো ইতস্তত করতেন না। জামা'তের অনেক কাজে তিনি আমাকে স্বানন্দে এবং মনোযোগের সাথে সাহায্য করেছেন। জামা'তের কল্যাণের বিষয়ে যদি তার মাথায় কোন ভালো চিন্তা আসতো তবে তিনি জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে যোগাযোগ করতেন এবং সেদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। তাঁর কথা ও কাজের মাঝে জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে পূর্ণ সহযোগিতা এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যেত। খেলাফতের জন্য ছিলেন নিবেদিত এবং অনুগত। যুগ-খলীফার দিক-নির্দেশনা বুঝে তদনুযায়ী আমল করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন।

তিনি বলেন, আমি সদা তাঁকে যুগ-খলীফার ইচ্ছা-আকাঙ্খা পূর্ণ অধ্যাবসায়ের সাথে আমল করতে সচেষ্ট পেয়েছি।

বুর্কিনা ফাসোর আমীর যিনি তাঁর আত্মীয়ও বটে- লেখেন, শৈশবের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে। তিনি সবে কয়েক মাসের শিশু, এমতবস্থায় ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। মনে হচ্ছিল জীবন প্রদীপ নিভে যাবে। সে সময় মাওলানা গোলাম রসূল সাহেব রাজেকী তাদের এলাকায় অবস্থান করছিলেন। তাঁর মা শঙ্কিত হয়ে তাঁকে মৌলভী সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন এবং মৌলভী সাহেবের কোলে তুলে দিতে গিয়ে বললেন, মৌলভী সাহেব! আমার সন্তান শেষ- একথা বলে ভীষণ কান্নাকাটি শুরু করলেন। মৌলভী সাহেব শিশু সন্তানকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, সে সুস্থ হয়ে যাবে, তাকে ধর্মের সেবায় উৎসর্গ করে দিও। এভাবে শৈশবেই তাঁর জীবন উৎসগীত হয়।তাঁর মা অঙ্গীকার করেন যে, আমার এ সন্তানকে আমি ওয়াকফ করব। তিনি নিজেও এ কথা বলতেন যে, আমি যেহেতু পড়ালেখায় ভাল ছিলাম না তাই আমাকে মীর সাহেব উপদেশ দিয়ে বলেন, এসেম্লির সময় সূরা ফাতিহা পড়তে থাকবে। অতএব আমি নিয়মিত (এসেম্লিতে সূরা ফাতিহা) পাঠ করতাম।

মুরব্বী সিলসিলাহ শামশাদ নাসের সাহেব বলেন, [প্রায় সবাই তার এ গুণের কথা লিখেছেন] তিনি খেলাফতের দিক-নির্দেশনার পরিপূর্ণ আনুগত্য করতেন। অধিকাংশ সময় অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও কাউকে কখনো বলেন নি অথবা নিজের কষ্ট কাউকে বুঝতে দেন নি। সর্বদা নিজ কাজে মনোযোগী ছিলেন এবং কঠোর অধ্যাবসায়ের সাথে কাজে লেগে থাকেন। প্রত্যেক ধরনের বিষয়ে দক্ষতা রাখতেন। প্রত্যেক জিনিস গভীরভাবে অধ্যায়ন করতেন। মুরব্বীদেরকেও পথনির্দেশ দিতেন। উত্তম ব্যবস্থাপকও ছিলেন এবং সঙ্গী-সাথীদের সাথে বিনম্র আচরণ করতেন। তিনি অতিথি আপ্যায়নে অভ্যস্ত ছিলেন। কেবল তার সন্তানরাই লেখেন নি বরং অন্যান্যরাও একথা লিখেছেন। সবার সাথে হাস্যবদনে সাক্ষাৎ করা তাঁর চরিত্র ছিল। খুব ধীর স্বভাবের ছিলেন কিন্তু সাহসিকতার সাথে কাজ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মেধার মাঝে অদ্ভুত ক্ষমতা রেখেছিলেন। তিনি মুরব্বী ছিলেন বটে কিন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যখন আর্থ স্টেশনে নিয়োগ দেন তখন প্রত্যেক জিনিস গভীরে গিয়ে অধ্যায়ন করেন এবং সেটিকে সফলতার শিখরে উন্নীত করেন।

প্রথম যখন ডিশ লাগানোর কাজ শুরু হয় যেন সেখান থেকে সমস্ত আমেরিকায় প্রোগ্রাম সম্প্রচারিত হতে পারে, তখন সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে অনুমতি নিতে হতো। অতএব সেখান থেকে একজন ইন্সপেক্টর আসে, সে অনুমতি দেয় নি, ফরমে স্বাক্ষর করে নি। তখন তিনি আমাকে লিখলেন। আমি তাকে বলেছিলাম, চেষ্টা করতে থাকুন, আল্লাহ্ সাহায্য করবেন। কিছুদিন পর সেখান থেকে পুনরায় আরেকজন ইন্সপেক্টর আসে যিনি মূলত ঘানার অধিবাসী ছিলেন। তিনি যখন জামা'তের নাম শুনলেন তখন বললেন, আমিও আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের স্কুলে পড়ালেখা করেছি। তিনি তাৎক্ষণিক সেখানে স্বাক্ষর করেন, ফলে অনুমতি লাভ হয়। এটিও আল্লাহ্ তা'লার এক বিশেষ সাহায্য ছিল। তাঁর চেষ্টা ও দোয়ার ফলে আল্লাহ্ তা'লা কাজ সহজ করে দিয়েছেন।

সুরিনাম থেকে লায়েক মুশতাক সাহেব বলেন, তিনি দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোতে সফর করেন এবং এমটিএ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। সুরিনামে তিন দিন অবস্থান করেন আর তিনি বলেন, যুগের খলীফা আমাকে একটি উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন। আমি শুধু এই কাজই করবো। তাই কোন আনন্দ ভ্রমণের প্রোগ্রাম হবে না আর এই পুরোটা সময় জামাতের সদস্যদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এম.টি.এ সংযোগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং যুবকদেরকে এম.টি.এ. সম্প্রচারে উদ্ভূত বিভিন্ন ধরনের সমস্যাবলি সমাধানের প্রক্রিয়া প্রশিক্ষণে ব্যয় করেছেন। তিনি বলেন যে, একবার তিনি আমাকে বলেন, এক মুরুব্বি আমাকে অভিযোগ করেন। মাঝে মাঝে কতক মুরুব্বি এমন অভিযোগ করে বসে আর এখনো এই অভিযোগ করে বসে যে, আমাকে সাত বছর জামেয়াতে পড়ানো হয়েছে। (অথচ) এখন আমাকে দপ্তরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে! জবাবে আমি (চৌধুরি মুনির সাহেব) তাকে বলেছিলাম, তিনি জবাব দেন, কার কাছে কখন কী (সেবা) নিতে হবে- এ ব্যাপারে যুগ খলিফা সবচেয়ে ভাল জানেন। তিনি বলেন, আমিও মোবাল্লেগ সিলসিলাহ্, কিন্তু বিগত পনের বছর ধরে যুগ খলিফার নির্দেশক্রমে টেলিপোর্টে র কাজ করছি। হাতে থাকে হাতুড়ি-প্লাস, টেকিনিক্যাল কাজও করি। যুগ খলিফার পক্ষ থেকে আমাকে যদি বলা হয় যে, অলি গলি ঝাড়ু দাও। তবুও আমি সন্তুষ্টচিত্তে এই কাজ করবো আর ক্লিনার বলে আখ্যায়িত হব।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও একবার বলেছিলেন, একটি সময় আসবে যখন আমাদেরকে মুরুব্বিদের এখানে নিয়োগ দিতে হবে,এমন নয় যে, অন্য অফিস স্টাফ (দাপ্তরিক কেরানি) নেওয়া হবে। তাই প্রত্যেক মুরুব্বিকে এই ধারণা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে যে, তার মাধ্যমে কী সেবা গ্রহণ করা হচ্ছে! যে কোন স্থানে যে কোন সেবাই গ্রহণ করা যেতে পারে। জামেয়াতে পড়েছেন- সে তো ভাল কথা। তারা ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করেছেন। এই ধর্মীয় শিক্ষার সদ্ব্যবহার করা উচিত।

যুক্তরাষ্ট্রের এমটিএ স্টুডিও বিভাগের ইনচার্জ গালিব খান সাহেব বলেন, প্রতিটি কাজ তিনি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করতেন। এর রেকর্ড সংরক্ষণ, স্টাফদের দেখাশুনা বা তদারকি, ভবনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি তিনি নিজে খেয়াল রাখতেন আর সর্বদা এদিকেই দৃষ্টি থাকত যে, ব্যবস্থাপনাকে কিভাবে সবচেয়ে সুচারু ও সুশৃঙ্খল করা যায়। তাছাড়া সহকর্মীদের সাথেও সর্বদা কোমল ব্যবহার করতেন। উত্তম ব্যবস্থাপক ছিলেন কিন্তু দৃঢ়চেতা ও সাহসী ছিলেন।

মির্যা মুহাম্মদ আফযাল সাহেব লিখেন, তাঁর সাথে আমার ৫৬ বছরের পরিচয়। একসাথে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলাম। তিনি ছিলেন খেলাফতের জন্য নিবেদিত -প্রাণ। ১৯৭৪ সালে তিনি খোদার পথে কারাবন্দীও হয়েছেন। সততা ও নিষ্ঠায় ছিলে টইটম্বুর। প্রেমপূর্ণ স্পৃহা ও চেতনা ধারণ করে সেবাদান করতেন। কাজকর্মের রীতিনীতি ছিল বেশ সুশৃঙ্খল। তাঁর স্বভাবে কোন ধরণের সেবাদানে অস্বীকারের প্রবণতা ছিল না। তাঁকে সর্বদা খেলাফতের সুলতানে নাসীর অর্থাৎ শক্তিশালী সাহায্যকারী দক্ষিণ হস্ত হিসেবেই পেয়েছি।

জাফর সারোয়ার সাহেবও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে যখন টেলিপোর্টের সূচনা হলো তখন তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আই.)-কে (একাজে) একজন ইঞ্জিনিয়ার (প্রকৌশলী) চেয়ে আবেদন করেন, (কেননা) এটি টেকনিক্যাল (কারিগরি) কাজ। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁকে জবাবে বলেন, আপনি নিজে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার চেষ্টা করুন।

অতঃপর তিনি নিজেই এই কাজ শিখেন আর এ ব্যাপারে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং অত্যন্ত সুচারুরূপে নির্ভরযোগ্যভাবে এসব কাজ শিখেন। দীর্ঘকাল তাঁর হৃদযন্ত্রের অসুস্থতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ২৯ বছর ব্যাপী এমটিএ-তে সেবাদান করেন। বর্তমানে উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকাতে তাঁর বদৌলতেই এমটিএ-র অনুষ্ঠানাদি নির্বিঘ্নে দেখা সম্ভবপর হয়েছে। লস এঞ্জেলেস, আমেরিকা থেকে ডাক্তার হামিদুর রহমান সাহেব লিখেন, ১৯৯৩ সালে লস এঞ্জেলেসে তাঁর বদলি হয়। আমাদের সাথে মিলে তিনি চীন নামক স্থানে জমি ক্রয় করেন। অতঃপর মসজিদ নির্মাণের চেষ্টা করেন।মরহুম অনেক নির্ভীক, সাহসী এবং খোদার প্রতি আস্থাশীল মানুষ ছিলেন। চীনের মেয়রের কাছে আহমদীয়া জামা'তকে পরিচয় করানোর জন্য তার অফিসে যান এবং পরিচয় করানোর পর চীনে মসজিদ নির্মাণের বিষয়ে বলেন। মেয়র সাহেব তৎক্ষণাৎ রাগান্বিত স্বরে বলেন, মসজিদ কোনোভাবেই নির্মাণ হবে না এবং এই বাক্যটি বলেন, over my dead body| এটি শুনেই চৌধুরি সাহেব অস্বাভাবিক আবেগ নিয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, মেয়র সাহেব! এই মসজিদ আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের স্থান আর তা নির্মাণ হবে এবং হবেই হবে। যাহোক, আলহামদুলিল্লাহ, সেখানে মসজিদ নির্মাণ হয়। অতঃপর সেই মেয়র সাহেবই মসজিদে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং এরপর তিনি কয়েকবার মসজিদে আসেন। (চৌধুরি সাহেব) অনেক সাহসী মানুষ ছিলেন।

মুরব্বী হাম্মাদ সাহেব, তার আত্মীয় ছিলেন মুনীর সাহেব, তিনি বলেন, আমি ফিল্ডে যাবার পর প্রথমে সমস্যার সম্মুখীন হই। অত্যন্ত স্নেহভরে আমার কথা শোনেন, আমাকে বুঝান, অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ করেন আর এভাবে আমার যে-সব বিষয় ও সমস্যা ছিল তা এমনিতেই সমাধান হয়ে যায়। অনেক বিষয়ে আমি তার কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতাম। এমটিএ-র ডিরেক্টর মুনীর শামস সাহেব বলেন, টেলিপোর্টের সেটআপ তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে করেছেন। চৌধুরী মুনীর সাহেবের গুণাবলির মাঝে একটি গুণ এটিও ছিল যে, প্রতিটি কাজে পরামর্শের ভিত্তিতে জামা'তের টাকা সাশ্রয়ের চেষ্টা করতেন এবং সেই পরামর্শ গ্রহণ করতেন যেটির ভীষণ প্রয়োজন হতো। তার প্রতিটি কথা ও কাজে খিলাফতের প্রতি অগাধ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার বহিঃপ্রকাশ ঘটত আর যুগ-খলীফার প্রতিটি কথার অক্ষর ধরে ধরে আমল করার চেষ্টা থাকত।

এমটিএ টেলিপোর্টের ডিরেক্টর ছিলেন কিন্তু কোনো লোকদেখানো কিংবা ভাব প্রকাশ ছিল না যে, আমি এ কাজ করেছি এবং আমার কারণেই এ সফলতা এসেছে। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কাজ করতেন বরং অন্যদের ক্রেডিট দিয়ে দিতেন। আমি দেখেছি, অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে তিনি ওয়াকফের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং নিঃস্বার্থভাবে আমেরিকা মহাদেশের সর্বত্র এমটিএ পৌঁছানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। ঈমানের ভিত্তিতে যা-ই ভালো মনে করেছেন সে বিষয়ে উত্তম পরামর্শ দিয়েছেন। আমাকেও লিখতে

(এরপর শেষের পাতায়.....)

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর জার্মানী সফর, ২০২৩ (সেপ্টেম্বর)

ওয়াকফে নওদের উদ্দেশ্যে ভাষণ

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও তাসমিয়া পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন–আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে আজ আপনারা ওয়াকফে নও ইজতেমায় অংশগ্রহণের সৌভাগ্য করেছেন। আমি আশা করি এবং আমার দোয়া থাকবে, যে সব ইতিবাচক এবং কল্যাণকর বিষয়াদি এখানে আপনারা শিখেছেন, সেগুলো যেন আপনাদের জীবনের স্থায়ী অংশ হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে স্থায়ী উন্নতি এবং কোন জাতির এবং গোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল, তাদের যুবকেরা যেন সবচেয়ে উন্নত নৈতিক গুণাবলি এবং শিক্ষা-দীক্ষার অধিকারী হয়। নিঃসন্দেহে মহানবী (সা.)-এর অনুসারীদের সব সময় ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা অনুসারে জীবন অতিবাহিত করা উচিত। কেবল তবেই তারা সত্যিকার মুসলমান বলে গণ্য হতে পারে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বার বার জামা'তের সদস্যদের সামনে এ বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন। যেমন একবার তিনি (আ.) বলেছেন, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তার জামা'তকে অন্যদের জন্য আদর্শস্থানীয় করতে চান।' এর অর্থ হল– হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অনুসারীদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলা উচিত। যে কোন শিক্ষার ওপর শতভাগ প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য সে বিষয়ের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আর এর অর্থ কী তা-ও বোঝা আবশ্যক। সব ওয়াকফে নও সদস্যের যত্নসহকারে পবিত্র কুরআন পড়া উচিত কেননা এটি সমগ্র মানবজাতির জন্য হেদায়াতের একমাত্র উৎস। প্রত্যহ সকালে আপনাদের কুরআন পাঠ করা উচিত এবং কুরআনে যে সকল আদেশ-নিষেধ রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করা উচিত। আল্লাহ্র অনেক কথা ও শিক্ষা মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র হাদীসের মাধ্যমেও আমরা জানতে পারি। এছাড়া এ যুগে আমরা একান্ত সৌভাগ্যবান যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা আমাদের সামনে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন এবং প্রকৃত শিক্ষার মর্ম তুলে ধরেছেন। তাই এই কুরআন পাঠের পাশাপাশি, হাদীস ও সুন্নতের জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি আহমদীদের প্রতিনিয়ত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তক পড়া উচিত। ওয়াকফে নও সদস্য হিসাবে আপনাদের সবসময় ধর্মীয় জ্ঞান সমৃদ্ধি চেষ্টায় লেগে থাকা উচিত কেননা আপনারা সবাই এই অঙ্গীকার করেছেন, যে আপনারা সবসময় ধর্মের সেবা করবেন। আপনারা আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার তখনই পূর্ণ করতে সক্ষম হবেন যখন আপনারা আপনাদের ধর্ম ও এর শিক্ষা সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হবেন।

একটি মৌলিক বিষয় আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই যেটি আনুগত্যের সাথে সম্পর্ক রাখে। আনুগত্য হল যে কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের বন্ধনকে শক্তিশালী করার প্রধান উপায়। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বলেন, যে কোন জাতি বা সম্প্রদায় ততক্ষণ পর্যন্ত উন্নতি করতে পারে না যতক্ষণ না তার সদস্যরা তাদের ইমামের প্রতি পূর্ণ অনুগত্য প্রদর্শন করে।এক ব্যক্তি যখন একটি বয়স সীমায় পৌঁছে তখন অনেক সময় তার মাথায় ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন দানা বাঁধে। বিশেষকরে যুবকেরা অনেক সময় প্রশ্ন করে যে, আমরা কেন এটি করবো আর সেটি কেন করবো না? যদি এমন প্রশ্ন এবং সন্দেহ কখনও আপনাদের মাথায় আসে বা দানা বাঁধে তাহলে কুরআন এবং হাদীসের শিক্ষা অনুযায়ী এর উত্তর অনুসন্ধানের চেষ্টা করুন। জামা'তের বই পাঠ করার মাধ্যমে এর উত্তর সন্ধানের চেষ্টা করুন। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে কোন মোবাল্লেগকে জিজ্ঞেস করুন যে, বিষয়টির অর্থ কী? অথবা আপনারা আমাকে প্রশ্ন লিখে পাঠাতে পারেন।

যাহোক, আপনাদের মনে কখনও যেন এই চিন্তা না আসে যে, আমাদেরকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা আমরা কেন মানব! বিশেষকরে আপনারা যারা ওয়াকফে নও, আপনাদের কখনও এমনটি ভাবা উচিত নয় কেননা আপনারা ইসলামের সেবায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করবেন বলে অঙ্গীকারবদ্ধ। আপনারা জামা'তের নির্দেশনা মোতাবেক জীবন অতিবাহিত করবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন। সত্যিকার অর্থে ওয়াকফে নওদের আনুগত্যের মান অন্যদের তুলনায় অনেক উন্নত হওয়া উচিত। তাই আপনাদের যা করতে বলা হয় বা জামা'ত যা করতে বলে তা যথাসাধ্য পালনের চেষ্টা করা উচিত।

ইতিহাস সাক্ষী, পূর্ববর্তী সেসব জাতি বা গোষ্ঠীর মাঝে আনুগত্যের মান উন্নত ছিল না, তারা বহু দলে বিভক্ত হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন, সত্যিকার অর্থে মহানবী (সা.)-এর পূর্বে যত নবী এসেছেন তাদের সবার জাতি আনুগত্যের অভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র যুগ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যে পবিত্র যুগ অতিবাহিত হয়েছে, সে যুগের মুসলমান বা মুসলিম উম্মতের মাঝে যে আনুগত্য ছিল তা কালের প্রবাহে ক্রমশ হারিয়ে গেছে আর এর ফলে আধ্যাত্মিক অমানিশার যুগ এসে গেছে। ক্রমশ মানুষ ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে। এক পর্যায়ে মানুষ সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় শিক্ষা পরিত্যাগ করেছে। এর ফলে তারা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এমনই ক্লান্তিলগ্নে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে ইসলামের সত্যিকার শিক্ষাকে পুনর্জীবিত ও পূণর্বাসনের জন্য প্রেরণ করেছেন। আপনাদেরকে এ জামা'তের সেবায় সদা সম্মুখ সারিতে থাকতে হবে- একথা কখনও ভুলবেন না। তাই আমি আবারও বলছি, ইসলামের প্রতি আনুগত্য ও ইমামের প্রতি আনুগত্য– এটি ধর্মের মৌলিক শিক্ষা।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেছেন, সত্যিকার মুসলমানের পুণ্যের ক্ষেত্রে এবং মানুষের কল্যাণ সাধনের ক্ষেত্রে সবসময় অগ্রগামী থাকা উচিত।তিনি (আ.) আরও বলেছেন, কারও প্রতি দয়া এবং মহানুভবতা একটি পুণ্যের জন্ম দেয়।

তাই যদি তাকওয়া ও সততার সাথে কাজ করেন তাহলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করতে পারবেন এবং ঐশী কল্যাণ ও আশিষধারায় আপনারা ধন্য হবেন।

তাই ওয়াকফে নওদের পুণ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করা উচিত। আপনাদের পুণ্যবান হওয়া উচিত এবং সদয় হওয়া উচিত। আপনারা হয়ত ভাবতে পারেন, ইসলাম কোন কোন কাজকে পুণ্য আখ্যা দেয়। পুণ্য কী বা ভাল কাজ বলতে কী বুঝায়? এক্ষেত্রে আমি পুনরায় বলছি, পবিত্র কুরআন মনোযোগ দিয়ে পাঠ করুন। কী ভাল আর কী মন্দ– তা আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, কুরআনে আল্লাহ্ তা'লার প্রায় ৭০০ আদেশ-নিষেধ রয়েছে। এগুলোর মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হল, খোদার ইবাদতের মাধমে তাঁর অধিকার প্রদান কর।আল্লাহ্র ইবাদতের মৌলিক উপায় হল, নামায প্রতিষ্ঠা করা। মুসলমান হিসাবে আমাদের প্রত্যেকের গভীর মনোযোগ দিয়ে নামায পড়া উচিত। পূর্ণ বিনয়ের সাথে নামায পড়া উচিত এবং পূর্ণ শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার সাথে নামায পড়া উচিত। যদি এভাবে আমরা নামায পড়ি তাহলে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হবে আর তাঁর সাথে সেতুবন্ধন রচনা হবে। আল্লাহ্র সাথে যদি আমাদের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক দৃঢ় হয় তাহলে অন্যান্য পুণ্যের দিকেও আমরা উন্নতি করতে পারবো। দ্বিতীয়ত আল্লাহ্র ইবাদতের পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তার সকল সৃষ্টির অধিকার প্রদানেরও নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের অন্যদের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও এখানে কিছু স্বল্প বয়সের কিশোররা রয়েছে। কিন্তু আপানাদের অধিকাংশ এমন যারা সাবালক। বরং বলতে হবে আপনাদের অধিকাংশ এখন খোদ্দাম যাদের স্ত্রী-সন্তান আছে। তাই আপনাদের এখন এই অযুহাত বা বাহানা করার সুযোগ নেই যে, আমাদের বয়স কম অথবা আমাদের হাতে সময় নেই। আপনাদের মনে রাখতে হবে, আপনাদের জন্মের পূর্বে আপনাদের জন্য অঙ্গীকার করা হয়েছে এবং আপনারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে নিজেরাও সেই অঙ্গীকার নবায়ন করেছেন। এখন আপনাদের ধর্মকে অন্য সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেওয়ার সময়। ধর্মের সেবা করার সময়। এগুলোর মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, আল্লাহ্র সাথে পবিত্র ও দৃঢ় সম্পর্ক রচনা করা। একথা ভুলে গেলে চলবে না, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, সবচেয়ে বড় ভয়, দুশ্চিন্তা যা এক আহমদীর হৃদয়ে থাকা উচিত, তার ভাবা উচিত, তা হল, তার হৃদয়ে তাকওয়া আছে কি-না? খোদাভীতি আছে কি-না? আর এটিই সব আহমদীর কাছে প্রত্যাশা করা হয়। সাধারণরা এরূপ চিন্তা করলে ওয়াকফে নও হিসেবে আপনাদের আরও বেশি চিন্তা করতে হবে। ওয়াকফে নওদের চিন্তা করা উচিত যে, আমাদের মাঝে তাকওয়া আছে কি-না? কখনও একথা মনে করবেন না যে, আপনাদের বয়স কম তাই এমন বিষয় চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। আগামী দিনের জন্য অপেক্ষা করবে না। আজ এক্ষুনি এটি নিশ্চিত করার সময় যে, আপনাদের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি কর্ম যেন খোদার ভালবাসার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। যদি আপনারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের চেষ্টা করেন তাহলে নিশ্চিত হতে পারেন, খোদা তা'লার আশিষ, কল্যাণ আর রহমত আপনাদের ওপর বর্ষিত হবে এবং তিনি

আপনাদেরকে তাঁর নিরাপত্তার বেষ্টনিতে রাখবেন। আল্লাহ্ প্রদত্ত আপনার সকল শক্তিবৃত্তি যেন পুণ্যকর্মে ব্যায় হয়- তা নিশ্চিত করুন।

তাকওয়া কী? চোখের ক্ষেত্রে তাকওয়া হল, শুধু সেগুলো দেখা যা আল্লাহ্ পছন্দ করেন এবং অপছন্দনীয় জিনিসের দিকে দৃষ্টি না দেয়া। তাকওয়া হল, নিজ হাত পুণ্যকর্মে ব্যবহার করা। এমন কাজে ব্যবহার না করা যা ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাকওয়া হল, মানুষের পা যেন আল্লাহ্র দিকে অগ্রসর হওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয় এবং পাপ থেকে দূরে যাওয়ার জন্য যেন পা ব্যবহার হয়। তাকওয়া হল, মানুষের মন এবং অন্তর যেন সবসময় সকল পাপ এবং অপবিত্র চিন্তাধারা থেকে দূরে থাকে। এ যুগে জীবনের সকল মোড়ে পাপ মানুষকে কলুষিত করার জন্য প্রস্তুত। এগুলো মানুষকে অনৈতিকতার দিকে এবং পাপের দিকে নিয়ে যায়। বিশেষকরে অনেক ক্ষতিকর অশালীন বিষয়াদি ইন্টারনেট এবং সোশাল মিডিয়ায় প্রচার এবং প্রসার করা হয়। অনেক অনৈতিক এবং ভয়াবহ বিষাক্ত স্ট্রিমিং হচ্ছে, অনলাইন গেম এবং টেলিভিশনে অনেক অনুষ্ঠান রয়েছে। আমাদের অভিজ্ঞতা হল, বর্তমানে সোশাল মিডিয়া ব্যবহারের ফলে এবং ভয়ংকর কনটেন্ট দেখার কারণে শিশু ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদের জীবনে ভয়াবহ ঘটনা ঘটছে। তাই সকল আহমদী, বিশেষকরে ওয়াকফে নওদেরকে এই বিষয়ে যে ঝুঁকি রয়েছে, তা থেকে সতর্ক থাকতে হবে। আপনাদের নৈতিক সাহস এবং দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে হবে। আর এমন ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক বিষয়াদি থেকে নিজেদের সুরক্ষা করতে হবে। শুধু সেই সমস্ত অনুষ্ঠান দেখুন যেগুলো শিক্ষামূলক এবং যেগুলোর দ্বারা মনের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। এমনসব অশালীন প্রোগ্রাম থেকে দূরে থাকুন, অন্যথায় এই ধরনের প্রোগ্রাম যদি আপনারা দেখেন তবে তা আপনাদেরকে এবং আপনাদের ব্যক্তিসত্তাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, তাকওয়া থেকে দূরে ঠেলে দিবে, আপনাদেরকে ধর্ম থেকে দূরে ঠেলে দিবে। ফলে একজন ওয়াকফে নও হিসেবে আপনি আপনার অঙ্গীকার পালনে ব্যর্থ হবেন।

তাই প্রতিদিন আত্মজিজ্ঞাসা করুন, নিজের আচরণ বিশ্লেষণ করুন। আজকে আপনারা এখানেই দৃঢ় অঙ্গীকার করুন যে, খোদার প্রতিটি নির্দেশকে চিহ্নিত করবেন এবং নিষ্ঠার সাথে সেগুলো পালনের চেষ্টা করবেন। যদি এটি করেন তবেই ওয়াকফে নও হিসাবে আপনার অঙ্গীকার পালিত হবে। আর আপনি জামা'তের জন্য তখনই কল্যাণকর হতে পারবেন। অনেক ওয়াকফে নও জিজ্ঞেস করেন, আমরা কীভাবে জামা'তের জন্য কল্যাণকর সত্তায় পরিণত হতে পারি? এর সহজ উত্তর হল, আল্লাহ্র নির্দেশ মেনে চলুন। আল্লাহ্র ইবাদতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করুন। সৃষ্টির সেবা করুন। সকল প্রকার অনৈতিক কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকুন। অশালীন কার্যকলাপ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করুন। এছাড়া আপনি যদি ছাত্র হয়ে থাকেন, আপনার পড়ালেখা মনোযোগ দিয়ে করা উচিত। পড়ালেখায় সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জনের চেষ্ট করুন। ওয়াকফে নও-এর বৈশিষ্ট্য এটি হওয়া উচিত যে, তারা যেন লেখাপড়ায় সবচেয়ে ভাল ফলাফল করে। আপনাদের সর্বোত্তম রেজাল্ট হওয়া উচিত। সব ওয়াকফে নওদের হয়ত জামা'তের কাজে নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। তাই ওয়াকফে নওদের উচিত, তারা যেন তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। উদাহরণস্বরূপ যদি আপনাকে বাইরে কাজ করার দিকনির্দেশনা বা অনুমতি দেয়া হয় তাহলে আপনাদের সে সমস্ত পেশা অবলম্বন করা উচিত যার ফলে আপনারা খোদার নৈকট্য অর্জন করতে পারবেন এবং যার ফলে মানব সেবার সুযোগ পাবেন। পৃথিবীর জন্য কল্যাণকর কাজ করতে পারবেন। কঠোর পরিশ্রম এবং পেশাগত সফলতার ফলে যেখানে আপনারা নিজে উপকৃত হবেন, সেখানে আপনাদের জন্য তবলীগের নতুন নতুন পথ উন্মুক্ত হবে এবং আপনারা নিজ গণ্ডিতে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারবেন।

সবশেষে আমি দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে সদা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে সমুন্নত রাখার, সুরক্ষা করার এবং তদনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন। আপনারা যেন পবিত্র কুরআনের শিক্ষার প্রকৃত মর্যাদা ও মূল্য অনুধাবন করতে পারেন এবং অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে জীবন-যাপন করতে পারেন। আপনারা সর্বদা জা'মা'তের জন্য গর্বের কারণ এবং সমাজ ও জাতির জন্য অসামান্য কল্যাণকার সত্তায় পরিণত হোন। আমি দোয়া করি, আপনারা যেন বস্তুবাদিতার করাল গ্রাস এবং অশুভতা ও অধার্মিকতার ভয়াবহ ছায়া থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারেন। আপনারা যেন পবিত্র কুরআনের চীরস্থায়ী ছায়ায় এবং মহানবী (সা.)-এর শিক্ষার ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন। আল্লাহ্ আপনাদেরকে সৌভাগ্য দিন।

লোকে সাধারণত মনে করে যে ইলহাম হলেই সে বড় পুণ্যবান ব্যক্তি হয়ে উঠল। অথচ এই বিষয়টিই যথেষ্ট নয়।শুধু ইলহামই বিচার্য নয়, এই বিষয়টিও দেখা হবে যে সেই ইলহামের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে কি না বা সেই ব্যক্তির সম্মান প্রকাশেরও কোন আঙ্গিক রয়েছে কি না।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা হিজর-এর ১০ নং আয়াত مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْٓا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ (আমরা ফিরিশতাগণকে অবতীর্ণ করি না, যথার্থ প্রয়োজন ব্যতিরেকে এবং (যখন তাহাদিগকে অবতীর্ণ করি) তখন তাহাদিগকে (কাফেরদিগকে) অবকাশ দেওয়া হয় না। -এর ব্যখ্যায় বলেন-

'হক' শব্দের অর্থ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। হতে পারে এখানে এর অর্থ সত্য বাণী, অর্থাৎ ফিরিশতাগণ ঐশীবাণী নিয়ে অবতরণ করেন। কিন্তু তুমি রসুল নও যে তোমার উপর ফিরিশতা অবতীর্ণ হবে। আর ঐশী বাণী দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার অধিকারও তোমার নেই- অথবা এখানে 'হক' শব্দের অর্থ 'হক' বা অধিকার দাবি করা। অর্থাৎ যার যতটা অধিকার, সেই অনুপাতে ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্ তা'লার নবী ও মোমেনদের উপর তাদের অধিকার অনুযায়ী 'হক ' অবতীর্ণ হয়। মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর উপর যে ফিরিশতা নাযেল হয়েছেন তিনি ছিলেন দয়ার ফিরিশতা। একমাত্র মহম্মদ রসুলুল্লাহই (সা.) তাকে দেখতে পেতেন। কিন্তু যারা খোদা তা'লার ক্রোধভাজন হয়েছে, তারা কিভাবে তাকে দেখতে পারে। তাদের উপর শাস্তির ফিরিশতাই নাযেল হবে আর তখন ফিরিশতাদের দেখা তাদের কোন উপকারে আসবে না। কেননা সেই ফিরিশতারা তাদেরকে ধ্বংস করতে আসবে আর তাদের আগমণের পর কাফেরের নেতাদেরকে কোনও প্রকার রেয়াত করা হবে না। বদরের যুদ্ধের সময় শাস্তিদানকারী এই ফিরিশতারা অবতরণ করেছিল এবং কিছু কাফেরদেরকে দিব্যদর্শনে দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তখন ছিল তাদের মৃত্যুর সময়। ফিরিশতাদেরকে দেখেই বা তাদের কি উপকার হত?

এখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বর্ণিত হয়েছে। সেটি এই যে, ফিরিশতাদের কাজ মানুষের হৃদয় অনুসারে হয়ে থাকে। যেমন মানুষ হবে, তেমন হবে তার ইলহাম। লোকে সাধারণত মনে করে যে ইলহাম হলেই বড় পুণ্যবান ব্যক্তি হয়ে উঠল। অথচ এই বিষয়টিই যথেষ্ট নয়। কেননা ইলহাম মানুষের প্রকৃতি অনুসারেই হয়ে থাকে। পার্বত্য অঞ্চলের এক অধিবাসী দিনমজুরী করার উদ্দেশ্যে প্রায় কাদিয়ানে আসত। সে প্রায় আমাদের এখানেই দিনমজুরী করত। কখনও সখনও কোন কোন কাজে হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.)-এর নিকট গেলে তিনি তাকে নামাযের উপদেশ দিতেন, যা শুনে সে উত্তর দিত, 'নামায সানু ইয়াজদি নিঁ'। (অর্থাৎ নামায আমাদের অবস্থার সঙ্গে মানানসই নয়।) হঠাৎ একদিন তিনি সেই ব্যক্তিকে মসজিদে নামায পড়তে দেখলেন। নামায শেষ হলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,'ব্যাপারটা কি?' সে উত্তর দিল,'আজ আমার উপর এই ইলহাম হয়েছে 'উঠ শূকর, নামায পড়।' সেই কারণেই আমি নামায আরম্ভ করেছি। স্পষ্টতই এই ইলহামটি শয়তানের পক্ষ থেকে হতে পারে না, নিশ্চয় খোদার পক্ষ থেকে ছিল, কিন্তু তার মর্যাদা সম্মত ছিল। কাজেই শুধু ইলহামই বিচার্য হবে না, এই বিষয়টিও দেখা হবে যে সেই ইলহামের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে কি না বা সেই ব্যক্তির সম্মান প্রকাশেরও কোন আঙ্গিক রয়েছে কি না।

এই আয়াত দ্বারা একটি সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে জানা যায় আর তা হল ফিরিশতারা সত্য সহকারে নাযেল হয়। অনুরূপভাবে মোমেনদের মাঝে নিম্ন ও উচ্চ মানের সকলেই রয়েছে। আবার নবীদের মর্যাদার মধ্যে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। হযরত খাতামান্নাবিঈন (সা.) সেভাবেই নবী নামে অভিহিত হয়েছেন যেভাবে যাকারিয়া, ইলিয়াস এবং ইউসুফ আলাইহিমুস সালামকে আমরা নবী বলে থাকি। কাজেই যেভাবে একই শ্রেণীভুক্ত হলেই সকলে সম মর্যাদার হয়ে যায় না, অনুরূপভাবে সকলের ওহীকে 'ওহী' বলা হলেও তা মর্যাদার ক্ষেত্রে এক নয়। প্রত্যেক নবীর বাণী তাঁর পদমর্যাদা অনুসারে হবে। এই নীতিকে দৃষ্টিপটে রেখে এই প্রশ্নটিও উত্তর পাওয়া যায় যে তওরাত, বাইবেল, যবুর প্রভৃতি গ্রন্থ কুরআন করীমের ন্যায় অতুলনীয় নয় কেন? যে নবীদের উপর সেই বাণী অবতীর্ণ হয়েছিল, তাঁদের মর্যাদা অনুযায়ীই খোদা তা'লা সেগুলিতে কল্যাণ রেখেছেন। খোদা তা'লা বিভিন্ন শ্রেণীর কাজ বিভিন্ন নবীর উপর ন্যস্ত করতেন আর তাদের সকলকে একই উপকরণ দিতেন- এটা কিভাবে সম্ভব ছিল? কাজ অনুপাতেই তাঁকে সরঞ্জাম দিতে হত, এবং সেই কাজ অনুপাতেই কর্মী নিযুক্ত করতে হত।

(তফসীর কবীর, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৩)

রোযা রাখতে বাধা নেই।

প্রশ্ন: যুক্তরাজ্য থেকে এক মুরুব্বী সাহেব হুযুর আনোয়ারের সমীপে সুনান তিরমিযির দুটি হাদীস উপস্থাপন করে জানতে চান যে, এই হাদীসদুটি কি সঠিক আর এগুলিকে আমরা প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ১৮ই আগস্ট, ২০২২ তারিখের চিঠিতে লেখেন-

'সুনান তিরমিযি এই হাদীস দুটি কিতাবুত তফসীরে বর্ণিত হয়েছে। এগুলির বিষয়বস্তু হল,

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

হুযুর (সা.) এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন,যা শুনে সাহাবাগণ জানতে চান যে, সে লোকগুলো কারা? হুযুর (সা.) হযরত সালমান ফার্সির কাঁধে হাত রেখে বললেন, এই ব্যক্তি ও তার জাতি, এই ব্যক্তি ও এর জাতি।

অপর এক রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সালমান ফার্সি (রা.) হুযুর (সা.)-এর পাশে বসেছিলেন। সাহাবাদের প্রশ্নে হুযুর (সা.) তাঁর উরুতে হাত চাপড়ে বললেন, এই ব্যক্তি ও সঙ্গীরা, সেই সঙ্গে বলেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ আছে, ঈমান যদি সপ্তর্ষিমণ্ডলে চলে যায় তবে পারস্য বংশীয় পুরুষরা তা অবশ্যই ফিরিয়ে আনবে।

একই ধরণের আরও একটি রেওয়াত বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, যেখানে সূরা জুমআর وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ আয়াত এর নযুল সম্পর্কে সাহাবাগণ জানতে চান যে, সেই সৌভাগ্যবান লোকেরা কারা যাদের মধ্যে আপনার পুনরাবির্ভাব ঘটবে। এর উত্তরে হুযুর (সা.) হযরত সালমান ফার্সির কাঁধে হাত রেখে বলেন,ঈমান যদি সপ্তর্ষিমণ্ডলে চলে যায় তবে পারস্য বংশীয় এক বা একাধিক পুরুষ তা অবশ্যই ফিরিয়ে আনবে।

বস্তুত এই দুই রেওয়ায়েতে হুযুর (সা.) একই যুগে একই ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। সুনান তিরমিযির বর্ণনাতেও মুসলমান জাতিকে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা ইসলামের শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও আর খোদা ও তাঁর রসুলের আদেশ অমান্য করে জাগতিক দুরাচারও পাপাচারে নিমজ্জিত হও, তবে আল্লাহ্ তা'লা এমন জাতির কাছ থেকে নিজের নেয়ামত তুলে নিবেন এবং পারস্য বংশোদ্ভুত এমন পুণ্যবান পুরুষ সেই ঈমানকে পুনরায় পৃথিবীর বুকে ফিরিয়ে আনবেন। সহীহ বুখারীর রেওয়ায়েতে এই সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, যখন জগতের অধঃপতনের কারণে আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীকে ঈমানের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করে দিবেন, তখন পৃথিবীতে যেহেতু সর্বত্র পথভ্রষ্টতা বিরাজ করবে (যা খোদা তা'লার আম্বিয়া ও প্রেরিত পুরুষদের আবির্ভাবের কারণ হবে) তখন বিশৃঙ্খলাপূর্ণ সময়ে জগতের সংশোধনের জন্য আল্লাহ তা'লা পারস্য বংশোদ্ভুত এমন এক পুণ্যবান পুরুষকে আবির্ভূত করবেন যিনি আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতিচ্ছায়া হবেন এবং তাঁর আগমণ হুযুর (সা.)-এর আগমণ হিসেবে গণ্য হবে। এই সকল ব্যক্তিরা ঈমানকে সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে পুনরায় পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

অতএব, উভয় পুস্তকের রেওয়াত সম্পূর্ণ সঠিক আর একটি অপরটিকে সমর্থন করছে। তাছাড়া উভয় হাদীসে একই যুগ সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। আমরা সহীহ বুখারীর রেওয়াতকে বেশি ব্যবহার করে থাকি, এজন্য যে, এই গ্রন্থ বেশি নির্ভরযোগ্য আর অধিকাংশ মুসলমান এটিকে কিতাবুল্লাহ্র পর সর্বাপেক্ষা সঠিক গ্রন্থের মর্যাদা পাওয়ার কারণে বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়।

প্রশ্ন: জামেয়া আহমদীয়া কানাডার এক ছাত্র হুযুর আনোয়ার (আই.) এর সমীপে লেখেন -'বর্তমান সময়ে মুরগী জবেহ না করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্যাসের মাধ্যমে তাদেরকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়ে থাকে। কিম্বা গলা না করে,,,,, করে যখন তাদের পালক ছাড়ানোর জন্য ফুটন্ত পানিতে ডোবানো হয়, তখন সেগুলির মৃত্যু ঘটে এবং সেগুলির রক্ত ক্ষরণ হয় না। এই পদ্ধতিতে জবেহ করা পশুর মাংস ভক্ষণ করা কি বৈধ? অনুরূপভাবে পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলিতে অধিকাংশ কসাই খানায় পশুগুলিকে অন্য পশুদের সামনে জবেহ করা হয়। জবেহ করার আগে ছুরিও তাদের সামনে থাকে আর পশুগুলিকে যখন হ্যাঙ্গারে ঝোলানো হয় তখন তাদের হাড়গোড় ভেঙ্গে যায়। এছাড়াও এই সব দেশে এমন সব লোকেরা পশু জবেহ করে যারা নাস্তিক কিম্বা এমন ধর্মের অনুসারী যাদের আহলে কিতাব বলা যায় না। অথচ ইসলাম কেবল আহলে কিতাবের হাতে জবেহ করা পশুর মাংস খাওয়াকে বৈধ আখ্যায়িত করেছে। তবে কি বড় বড় কসাইখানার মাংসের পরিবর্তে ছোট ছোট হালাল দোকান থেকে মাংস কেনা বেশি নিরাপদ নয়?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২২শে আগস্ট, ২০২২ তারিখের চিঠিতে বলেন:

গ্যাসের মাধ্যমে শ্বাসরোধ করে হত্যা করার পশু বা জবেহ না করে ফুটন্ত পানিতে হত্যা করা পশুর মাংস ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল নয়। আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে কুরআন করীমে বলেছেন-

وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

এবং উহা, যাহার উপর আল্লাহ্র নাম ব্যতিরেকে অপরের নাম উচ্চারণ করা হয়, এবং শ্বাস রোধ করিয়া নিহত জীব, এবং প্রহারে নিহত জীব এবং উচ্চ স্থান হইতে নিপতনে মৃত-জীব, এবং শৃঙ্গাঘাতে মৃতজীব, এবং ঐ জন্তুকে যাহাকে হিংস্রপশু খাইয়াছে এবং উহাকে ছাড়া যাহাকে (মরার, আগে) যবাহ করিয়া লইয়াছ।

(সূরা মায়েদা:৪)

আর যতদূর পশুদের অচেতন করার বিষয়, তাদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বাঁচাতে অর্ধঅচেতন করা হয়,যার পর জবেহও করা হয়, রক্তক্ষরণও হয়। কেননা অর্ধ অচেতন হলেও হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্ক দুটিই কাজ করে। তবে পশুদেরকে যদি গলা নীচের দিক থেকে জবেহ করার পরিবর্তে উপরের দিক থেকে ঝটকা দিয়ে গলা কেটে ফেলা হয় তবে ইসলামী শিক্ষানুসারে সেটা খাওয়া বৈধ নয়। কিন্তু পশ্চিমি দেশগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পশুদেরকে গলার নীচের দিক থেকেই জবেহ করা হয়।

আরেকটি বিষয় হল সেই সব পশুদের অন্যান্য পশুদের সামনে জবেহ করা হয় কিম্বা ছুরি তাদের সামনেই থাকে কিম্বা জবেহ করার পর তাদেরকে হ্যাঙ্গারে ঝোলালে অনেক সময় তাদের হাড় ভেঙ্গে যায় বা তাদেরকে এমন সব লোক জবেহ করে যারা নাস্তিক কিম্বা এমন ধর্মের অনুসারী যারা আহলে কিতাব নয়-তাই সেই সব পশুদের জবেহ করার সময় তারা আল্লাহ্র নাম নেয় না। এই সব বিষয়গুলি জবেহ কৃত পশুর মাংসের হালাল বা হারাম নিয়ে কিছু যায় আসে না। তবে শর্ত হল সেই সব পশুগুলিকে যেন মানব স্বাস্থ্য নীতি অনুসারে গলার নীচের দিক থেকে জবেহ করা হয় এবং সেগুলির জন্য আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নাম না নেওয়া হয়। এমন মাংস খাওয়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়ে খাওয়া বৈধ হবে।

তাই অনেক বেশি চুলচেরা বিশ্লেষণ করা এবং এ নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়া নিজের জন্য অকারণ সমস্যা ডেকে আনা উচিত নয়। হাদীসে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আশেয়া (রা.) বর্ণনা করেন-

"অর্থাৎ কতিপয় ব্যক্তি নিবেদন করল, হে রসুলুল্লাহ্ ! আমাদের কাছে কিছু মানুষ মাংস নিয়ে আসে, আমরা জানি না যে তারা সেটা জবেহ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে কি না। একথা শুনে রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তোমরা সেই মাংস আল্লাহর নাম পড়ে খেয়ে নিও।"

(সহী বুখারী, কিতাবুল বুইয়ু)

অনুরূপভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সমীপে নিবেদন করা হয় যে, হিন্দুদের হাতে খাওয়া কি উচিত? হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: শরিয়ত বিষয়টিকে 'মাবাহা' রেখেছে। এমন নিষেধাজ্ঞার প্রতি শরিয়ত জোর দেয় নি, বরং শরিয়ত قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا এর উপর জোর দিয়েছে। আঁ হযরত (সা.) আর্মেনীয়দের হাতে তৈরী খাদ্য খেয়ে নিতেন আর তা ছাড়া উপায়ও তো নেই।

(আল হাকাম, নম্বর-১৯, ১০ই জুন, ১৯০৪, পৃ: ৩)

তাই মানুষের উচিত সন্দেহে না পড়ে তাকওয়ার পথ অবলম্বন করার মাধ্যমে জাগতিক ও ধর্মীয় বিষয়াদির নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করা। আর যেখানে সরাসরি কোন নিষিদ্ধ বিষয়ের মধ্যে পড়ার সম্ভাবনা থাকে বা কোন বিষয়ের নিষেধ হওয়া স্পষ্টভাবে দেখা যায় সেগুলি থেকে অবশ্যই বিরত থাকা উচিত। এ বিষয়ে হুযুর (সা.)আরও একটি হাদীস আমাদের পথপ্রদর্শন করে। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন- "নবী করীম (সা.) কে যখনই দুটি জিনিস বেছে নেওয়ার বিকল্প দেওয়া হয়েছে, তিনি তাদের মধ্য থেকে সহজতর বিকল্পটি বেছে নিয়েছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সেটি পাপ সংক্রান্ত বিষয় না হয়। পাপের বিষয় হলে তিনি (সা.) তা থেকে অনেক দূরে থাকতেন।"

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল হুদুদ)

অনুরূপভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সম্পর্কে এও বর্ণিত হয়েছে যে,একবার আমেরিকা ও ইউরোপের বিস্ময়কর উদ্ভাবনের কথা উঠল। এরই মাঝে এ বিষয় নিয়েও আলোচনা হয় যে, দুধ, সুপ প্রভৃতি প্যাকেটজাত যে সব খাদ্য বিলেত থেকে এদেশে আসে সেগুলি অত্যন্ত বিশুদ্ধ মানের হয়ে থাকে আর এগুলির আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল এগুলিকে হাত দ্বারা মোটেই স্পর্শ করা হয় না। এমনকি দুধও মেশিনের সাহায্যে দোহন করা হয়। একথা শুনে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: নাসারা (খৃষ্টান) জাতি যেহেতু বর্তমানে এমন এক জাতিতে পরিণত হয়েছে যারা ধর্মের সীমারেখা এবং হারাম ও হালালের বিষয়ে কোন ভ্রুক্ষেপ করে না। তাদের মধ্যে ব্যপকহারে শূকরের মাংসের প্রচলন রয়েছে। আর যারা জবেহ করে তারা খোদার নামে জবেহ করে না। বরং

যেমনটি শোনা যায়, ঝটকা পদ্ধতিতে ধড় থেকে মুণ্ডু পৃথক করে দেওয়া হয়। তাই সন্দেহ হতে পারে যে, তাদের কারখানায় যে সব বিস্কুট ও দুধ উৎপাদন হয় সেগুলিতে শূকরের চর্বি এবং শূকরের দুধের মিশ্রন থাকতে পারে। তাই আমাদের মতে বিলেতি বিস্কুট এবং এই ধরণের দুধ ও সুপ ব্যবহার করা সর্বৈব তাকওয়ার পরিপন্থী এবং অবৈধ। বিলেতে যেভাবে শূকর পালন ও ভক্ষনের প্রচলন রয়েছে, তাতে আমরা কিভাবে মেনে নিব যে তাদের দ্বারা উৎপাদিত অন্যান্য খাদ্য পণ্যতে এই ধরণের কোন সংমিশ্রণ থাকবে না?

একথা শুনে আরবে প্রসিদ্ধ রেঙ্গুনের বণিক আবু সাঈদ সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সমীপে একটি ঘটনা উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, রেঙ্গুনে ইংরেজদের বিস্তুট ও পাউরুটি তৈরীর একটি কারখানা ছিল। এক মুসলমান ব্যবসায়ী সেটি প্রায় দেড় লক্ষ টাকায় কিনে নেয়। সে হিসেবের খাতাপত্র পরীক্ষা করে দেখে জানতে পারল যে,এই কারখানায় নিয়মিত শূকরের চর্বিও কেনা হত। জিজ্ঞাসাবাদ করলে কারখানা কর্তৃপক্ষ জানালেন, 'এটা আমরা বিস্কুট তৈরীতে ব্যবহার করে থাকি, কেননা, এটা ছাড়া বিস্কুট মুখরোচক হয় না আর বিলেতেও এই চর্বি বিভিন্ন খাদ্যপণ্যে মেশানো হয়ে থাকে।

এই ঘটনা শোনার পর শ্রোতারা জানতে পারবেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর চিন্তাধারা কতটা সূক্ষ্ম ও তাকওয়া ভিত্তিক ছিল। কিন্তু আমাদের মাঝে যেহেতু কিছু এমন মানুষও ছিল যাদেরকে প্রায় সফর করতে হয়েছে আর কেউ কেউ সুদূর আফ্রিকার দেশ ও শহরে এখনও রয়েছেন, যাদের এই ধরণের বিস্কুট ও দুধের প্রয়োজন হতে পারে। তাই তাদেরকেও দৃষ্টিপটে রেখে পুনরায় এই বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। এছাড়াও হিন্দুস্তানের খাওয়াদাওয়ার বিষয়ে নিবেদন করা হয় যে, এরাও জিনিসপত্র খুব নোংরা রাখে, কুকুরে প্রায় এদের কড়াই চেটে দিয়ে যায়। একথা শুনে হুযুর (আ.) বলেন, আমার মতে নাসারাদের সেই সব খাদ্য হালাল যেগুলিতে সন্দেহ থাকে না আর কুরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে হারাম নয়। অন্যথায় এর এটাই অর্থ দাঁড়াবে যে, কিছু খাদ্যকে হারাম মনে জেনে বাড়িতে খেলাম না, কিন্তু বাইরে নাসারাদের হাতে খেয়ে ফেললাম। আর নাসারাদের কথাই বা কেন, যদি একজন মুসলমানও সন্দেহপূর্ণ অবস্থায় থাকে,তবে তার খাবার খেতে পারব না। যেমন একজন যদি উন্মাদ হয় আর সে হালাল বা হারাম সম্পর্কে উদাসীন, এমতাবস্থায় তার খাবার বা তার তৈরী খাবারে কিভাবে বিশ্বাস করা যায়? এই কারণেই আমি বাড়িতে বিলেতি বিস্কুট ব্যবহার করতে দিই না, বরং হিন্দুস্তানের হিন্দু কোম্পানির বিস্টুট কিনে থাকি।

খৃষ্টানদের তুলনায় হিন্দুদের অবস্থা কিছুটা বাধ্যবাধকতা, কেননা অনেক বেশি তাদের সঙ্গে আমাদের মেলামেশা আর সর্বত্র তাদেরই দোকান। যদি মুসলমানদের দোকান থাকে আর সমস্ত সামগ্রী সেখানেই পাওয়া যায় তবে খাদ্যদ্রব্য (অন্যদের) তাদের থেকে কেনা উচিত নয়।

সারসংক্ষেপ এই যে, মানুষের খুব বেশি সন্দেহে পড়ে বৈধ জিনিস ব্যবহার করা থেকে অকারণ বিরত থাকার দরকার নেই আবার অসতর্ক জীবনযাপন পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রত্যেক বৈধ ও অবৈধ বস্তু ব্যবহারের চেষ্টা করাও উচিত নয়। বরং একটা পরিমিত সীমা পর্যন্ত যাচাই বিচার করে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপন করার চেষ্টা করা উচিত।

প্রশ্ন: রোযা রাখা অবস্থায় যদি কোন নারীর ঋতুস্রাব আরম্ভ হয় তাহলে কি তার রোযা ভেঙ্গে ফেলা উচিত না-কি রোযা পূর্ণ করা উচিত? আর যখন এই বিশেষ দিনগুলো শেষ হয়ে যায় তখন সেহেরী খাওয়ার পরে কি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে পারবে, না-কি সেহেরীর পূর্বেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে? হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ৩০ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের পত্রে এসব প্রশ্নের নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন। হুযূর বলেন, :নারীর এই স্বভাবজ অবস্থাকে পবিত্র কুরআন অর্থাৎ, কষ্টদায়ক অবস্থা আখ্যা দিয়েছে। আর এই অবস্থায় ইসলাম নারীকে সকল প্রকার ইবাদত থেকে অবকাশ দিয়েছে। কাজেই, যখনই ঋতুস্রাব আরম্ভ হয়ে যায় তখনই রোযা ভেঙ্গে যায়। আর এই দিনগুলো পুরোপুরি শেষ হওয়ার পর এবং পরিপূর্ণরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার পরই রোযা রাখা যেতে পারে। আর এসব দিনে যে রোযা (শুরু থেকে শেষ হওয়ার দিন পর্যন্ত) ভাঙ্গা পড়বে, সেসব রোযা রমযানের পরে অন্য যে কোন সময়ই পূর্ণ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন:এক বন্ধু হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর নামে প্রেরিত পত্রে হযরত সওবান (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, 'মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের একটি খাজানা বা ধনভাণ্ডারের জন্য তিন ব্যক্তি যুদ্ধ করবে (এবং মারা যাবে) তিনজনই খলীফাদের (অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধানদের) সন্তান হবে কিন্তু সেই খাযানা তাদের কেউই পাবে না। এরপর পূর্বদিক থেকে কালো পতাকা দৃশ্যমান হবে, সে তোমাদেরকে এমনভাবে হত্যা করবে যে, ইতিপূর্বে অন্য কেউ এভাবে হত্যা করে নি। এরপর তিনি (সা.) আরও কিছু কথা বলেছেন যা আমার মনে নেই। এরপর বলেন, যখন তুমি তাঁকে (অর্থাৎ মাহদীকে) দেখবে তখন তাঁর হাতে বয়আত করবে যদি তোমাকে বরফের পাহাড়ের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়, কেননা তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা আল-মাহদী।' উক্ত হাদীসের একটি অংশের ব্যাখ্যা করে সে সম্পর্কে হুযূরের মতামত জানতে চেয়েছেন। ওপরন্তু হাদীসের আরেকটিঅংশ সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ৩০ মে, ২০২০ তারিখের পত্রে এই প্রশ্নের নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন। হুযূর বলেন, 'আপনি এই হাদীসটি আল্ বাহরুয্ যাখার থেকে উদ্ধৃত করেছেন অথচ এই হাদীসটি সিহাহ্ সিত্তার সুনান ইবনে মাজাহ্'র কিতাবুল ফিতানের খুরুজুল্ মাহদী অধ্যায়েও বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত খাযানা ও খলীফাদের পুত্রদের বিষয়ে আপনার বর্ণিত ব্যাখ্যা একটি রুচিশীল ব্যাখ্যা।

আমার মতে, এই হাদীসে মহানবী (সা.)-এর উম্মতের মাঝে অনাগত যুগে দৃশ্যমান বিভিন্ন ঘটনার সংবাদ দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে কোন কোন ঘটনা পার্থিব বিষয়াদি সংক্রান্ত এবং কতক আধ্যাত্মিক বিষয়াদি সংক্রান্ত। যদিও অনেক আলেম-ওলামা খাযানা বলতে বুঝেছেন কাবা গৃহের খাযানা। কিন্তু সেই খাযানা বা ধনভাণ্ডার তো বিভিন্ন শাসকেরও হস্তগত হয়েছে। তাই হাদীসে বর্ণিত খাযানা বা ধনভাণ্ডারের অর্থ কাবাগৃহের খাযানা হতে পারে না কেননা, হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন, সেই খাযানা বা ভাণ্ডার তাদের মধ্য হতে কেউ-ই পাবে না।

অতএব, এর অর্থ হচ্ছে, সেই আধ্যাত্মিক ধনভাণ্ডার, যা মহানবী (সা.) তাঁর (তিরোধাণের) পরে 'খেলাফত আলা মিন হাজিন নবুয়্যত' (নবুয়্যতের ধারায় প্রবর্তিত খেলাফত) প্রতিষ্ঠার আদলে সুসংবাদ আকারে প্রদান করেছিলেন। আর এই ধনভাণ্ডার লাভ করার জন্য পবিত্র কুরআন সর্বপ্রথম ঈমান ও সংকল্পকে শর্ত নির্ধারণ করেছেন যা সেসব জাগতিক শাসকদের মধ্য হতে হারিয়ে গিয়েছিল। তাই তারা সেগুলো লাভ করার জন্য অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছে কিন্তু সেই আধ্যাত্মিক খাযানা বা ধনভাণ্ডার কারও হস্তগত হয় নি।

এ কারণেই মহানবী (সা.) এই হাদীসে খাযানার জন্য যারা যুদ্ধ করবে তাদের জন্য কেবল 'ইবনে খলীফা' শব্দাবলি ব্যবহার করেছেন। অন্য কথায়, তারা হবে সেই খলীফার উত্তরসূরি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খলীফা বা নবুয়্যতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত খেলাফতের অধীনস্ত খলীফা হবেন না। অথচ, এই হাদীসেই মহানবী (সা.) সেই ব্যক্তির জন্য, যার এই নবুয়্যতের ধারায় প্রবর্তিত খেলাফতরূপি আধ্যাত্মিক ধনভাণ্ডার লাভ করার কথা- তিনি হবেন,'খলীফাতুল্লাহিল মাহদী' বা 'আল্লাহ্‌র খলীফা আল-মাহদী' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

এই হাদীসে মুসলমানদের হত্যার যে উল্লেখ রয়েছে, এ সম্পর্কে আপনি আপনার মতামত প্রকাশ করেছেন যে, তামাহদীর মাধ্যমে হবে। আমার মতে এটি সঠিক নয়। এর অর্থ যদি বাহ্যিক হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাত করা হয় তাহলে এটি কোনভাবেই মাহদীর মাধ্যমে হওয়া সম্ভব নয় বরং এর অর্থ হবে মহানবী (সা.)-এর আরেকটি (মিশকাতুল মাসাবীহ্‌তে বর্ণিত) হাদীস অর্থাৎ 'মুলকান আযযান এবং মুলকান জাবারিয়্যাতান' বাক্যাবলিতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই উভয় যুগে মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক বিভিন্ন যুদ্ধে সংঘটিত রক্তপাত ও খুনোখুনি। এছাড়া ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গোলিয়ানদের হাতে মুসলমানদের গণহত্যা হচ্ছে এর মর্মার্থ।

আল্লাহ্‌র খলীফা আল-মাহদীর মাধ্যমে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত না হওয়ার আরেকটি দলিল হল, মহানবী (সা.) আগমনকারী মাহদীর একটি চিহ্ন বর্ণনা করেছেন 'ইয়াযাউল হারব' অর্থাৎ, তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহ আর খুনোখুনি রহিত করবেন। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, বাব নুযূলে ঈসা)। কাজেই, এটি কীভাবে সম্ভব হতে পারে যে, একদিকে মহানবী (সা.) আগমনকারী মাহদীকে শান্তি ও সৌহার্দ্যের পতাকাবাহী আখ্যা দিচ্ছেন আবার অপরদিকে তাঁর মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতের লোকদের এমন রক্তপাতের সংবাদ দিচ্ছেন যে, এমন রক্তপাত অতীতকালে কখনও কেউ দেখে নি।

এছাড়া এই হাদীসে রাবী বা বর্ণনাকারীর এই বক্তব্য, অর্থাৎ 'এরপর হুযূর (সা.) আরও কিছু কথা বলেছেন, যা আমার স্মরণ নেই'- (এটি) বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। আর বেশিরভাগ সম্ভাবনা এটিই যে, সেসব বিষয় দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া সম্পর্কিত হবে। কেননা, হাদীসের গ্রন্থাবলিতে অগণিত এমন রেওয়ায়েত বিদ্যমান, যেগুলোতে মহানবী (সা.) দাজ্জালের ফিতনা বা নৈরাজ্যকে সবচেয়ে বড় নৈরাজ্য আখ্যা দিয়েছেন আর তাকে মোকাবিলা করার জন্য তাঁর উম্মতকে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমনের সুসংবাদ

দিয়েছেন। রাবী'র বক্তব্য অনুযায়ী এসব কথার পর মহানবী (সা.) হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর হাতে বয়আত করা অপরিহার্য আখ্যা দিতে গিয়ে তাকিদ প্রদান করেছেন যে, যদি তোমাদেরকে বরফের পাহাড়ের ওপর হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয় তবুও তাঁর হাতে বয়আত করবে, কেননা তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা আল-মাহদী।

অতএব, মহানবী (সা.) এই হাদীসে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন যুগের উল্লেখ করেছেন। একটি হল সেই যুগ, যা মহানবী (সা.) এবং খেলাফতে রাশেদার আশিসপূর্ণ যুগ, যেটি ঐশী প্রজ্ঞার অধীনে শেষ হয়ে যাবে। এরপর মুসলমানরা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ করবে এবং নিজেদের লোকদেরকেই তরবারি দিয়ে হত্যা করে তাদের রক্ত প্রবাহিত করবে। তখন তারা সেই আধ্যাত্মিক ধনভাণ্ডার থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত সেই যুগ, মুসলমানরা যখন জাগতিক দিক থেকেও দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের অ-মুসলমান বিরুদ্ধবাদীরা তাদেরকে রক্তপাতের লক্ষ্যে পরিণত করবে। এরপর তৃতীয়ত সেই যুগ, যখন মহানবী (সা.) প্রদত্ত শুভসংবাদ অনুযায়ী ইমাম মাহদী এবং মুহাম্মদী মসীহ্‌র আবির্ভাব ঘটবে এবং উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সেই অংশ যারা মহানবী (সা.)-এর এই নিষ্ঠাবান দাস ও আধ্যাত্মিক সন্তানের হাতে বয়আত করে তাঁর ক্রোড়ে আশ্রয় নিবে, তাদের জন্য পুনরায় সেই সতেজ বা প্রাণবন্ত যুগ আসবে- উম্মতে মুহাম্মদীয়া স্বীয় মনিব ও অভিভাবক হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পবিত্র যুগে যা প্রত্যক্ষ করেছিল আর এখন পুনরায় 'যারা আমাকে পেয়েছে তারা সাহাবীদের সাথে মিলিত হয়েছে'- এই ভবিষ্যদ্বাণী সেসব সৌভাগ্যবানদের অনুকূলে পূর্ণ হবে।

হাদীসে বর্ণিত হত্যাকাণ্ডকে যদি রূপক হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে- যেভাবে সহীহ্ বুখারীতে 'ইয়াযাউল হারব' সংক্রান্ত হাদীসে বর্ণিত 'ফা ইয়াকসিরুস সালীবা ওয়া ইয়াকতুলুল খিনযির'-এর প্রকৃত অর্থ, ক্রুশ ধ্বংস করা এবং শূকর বধ করা নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে ইসলামের প্রতি ছুঁড়ে দেওয়া বিভিন্ন আপত্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া।

অনুরূপভাবে ইমাম মাহদীর মাধ্যমে মুসলমানদের হত্যা করার অর্থ হবে, তাদের মাঝে প্রচলিত ভুল বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করা এবং ধর্মের সংস্কার করে সেটিকে হুবহু মহানবী (সা.)-এর শিক্ষামালা অনুযায়ী বিশ্বে প্রবর্তন করা।

কাজেই, আমার মতে এই হাদীসটিকে যদি এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় তাহলে অধিক যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা করা সম্ভব আর হত্যাকাণ্ডের বিষয়টিও সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

প্রশ্ন:জনৈক আরব বন্ধু হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে লিখেছেন, আবাযিয়াহ্ ফিরকার হাদীস গ্রন্থ মুসনাদ আর্-রাবী' বিন হাবীব-এ বর্ণিত হাদীসগুলোকে কি আহমদীয়া জামা'ত সঠিক হাদীস বলে মনে করে এবং এর ওপর আমল করে কি?

হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ৩০ মে, ২০২০ তারিখের পত্রে এই জিজ্ঞাসার উত্তরে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেন। হুযূর বলেন, 'হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অমৃতবাণীর আলোকে মহানবী (সা.)-এর হাদীস সম্পর্কে আহমদীয়া জামা'তের বিশ্বাস হল, পবিত্র কুরআন ও সুন্নতের পর হেদায়েতের তৃতীয় মাধ্যম হল হাদীস। আর তা (অর্থাৎ হাদীস) কুরআন ও সুন্নতের সেবক। তবে, যে হাদীস কুরআন ও সুন্নত বিরোধী এবং এমন হাদীসেরও পরিপন্থি যা কুরআন সম্মত অথবা এমন হাদীস যা সহীহ্ বুখারীর বিরোধী, তাহলে এমন হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না কেননা, তা গ্রহণ করলে কুরআন এবং ঐসব হাদীস যা কুরআন সম্মত, সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, 'আমাদের জামা'তের উচিত, যদি কোন হাদীস কুরআন ও সুন্নত বিরোধী ও পরিপন্থি না হয় তাহলে তা যত নিম্নমানের হাদীসই হোক না কেন তার ওপর যেন তারা আমল করে এবং মানবসৃষ্ট ফিকাহ্‌র ওপরে একে অগ্রাধিকার প্রদান করে।'

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেছেন, 'পবিত্র কুরআন অনুসরণ করুন। আর খোদার পয়গম্বর (সা.) কর্তৃক সত্যায়িত হাদীসের অনুসরণ করুন। দুর্বল থেকে দুর্বল হাদীস হলেও আমরা সেটি আমলযোগ্য জ্ঞান করি, কিন্তু শর্ত হল- সেটি যেন পবিত্র কুরআন বিরোধী না হয়।'

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেছেন, 'যদি এমন কোন হাদীস, যেটি স্পষ্টভাবে পবিত্র কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক, তবে তা বুখারী কিংবা মুসলিমেরই হোক না কেন আমরা কখনও সেটির খাতিরে এই ধরনের অর্থ গ্রহণ করবো না যদ্বারা পবিত্র কুরআনের বিরোধিতা হয়।'অতএব, উপরিউক্ত মাপকাঠির নিরিখে যে হাদীসই সঠিক সাব্যস্ত হবে, তা যে কোন গ্রন্থেই বর্ণিত হোক না কেন, সেটি আহমদীয়া জামা'তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য ও ন্যায়সঙ্গত।

প্রশ্ন:কোন নারী যদি স্বেচ্ছায় নিজের সন্তানকে তার বড় জা'কে দিয়ে দেয় এবং এর অনেক বছর পর উভয় পরিবারের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে মায়ের দাবি নিয়ে সন্তানকে ফেরত চায় তাহলে কী করণীয়- এ সংক্রান্ত একটি পত্র হুযূর আনোয়ার (আই.) পেয়েছেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ২৪ জুন, ২০২০ তারিখের পত্রে এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেন। হুযূর বলেন, 'সাধারণ জাগতিক জিনিসপত্র লেনদেনের ক্ষেত্রেও মানুষ যখন নিজের ইচ্ছায় এবং সানন্দে কাউকে নিজের কোন জিনিস দিয়ে দেয়, এরপর সেই জিনিস ফেরত চাওয়াকে পছন্দের দৃষ্টিতে দেখা হয় না। সন্তান যদিও এমন কোন জাগতিক জিনিসের মধ্যে গণ্য হয় না, কিন্তু তারপরও কেউ যখন নিজের ইচ্ছায় এবং সানন্দে কাউকে নিজের সন্তান দিয়ে দেয় আর অপর ব্যক্তি তাকে নিজের সন্তানের মতো লালনপালন করতে থাকে, তাহলে তাকে ফেরত চাওয়াও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পছন্দনীয় নয়। তাই জামা'তের কাযা বা বিচার বিভাগ সকল অবস্থা বাপরিস্থিতি যাচাই করে এই সিদ্ধান্তই প্রদান করেছে যে, আপন মায়ের তার সন্তানকে ফেরত চাওয়ার দাবি যথার্থ নয়।

আমার মতে, শিশুর বয়স যদি নয় বছরের উর্ধ্বে হয় তাহলে ফিকাহ্ বা আইনশাস্ত্রের খিয়ার আল্-তমীয অনুযায়ী এই বিষয়ের সমাধান হওয়া উচিত এবং শিশুটির কাছে জিজ্ঞেস করা উচিত যে, সে কার কাছে থাকতে চায়? শিশুটি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে যেখানে যাওয়ার আগ্রহ দেখাবে শিশুটিকে সেখানেই রাখা হোক।

আপনাদের উভয় পরিবারকে আল্লাহ্ তা'লা বিবেক-বুদ্ধি দান করুন। আপনারা খোদা তা'লার ভয় ও তাকওয়াকে দৃষ্টিতে রেখে শুধু তাঁর সন্তুষ্টির খাতিরে পরস্পরের জন্য নিজেদের বৈধ অধিকার ত্যাগ করে হলেও এই বিবাদ মীমাংসা করুন, আমীন।

প্রশ্ন:গত ৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সাথে জামেয়া আহমদীয়া, ঘানার শিক্ষার্থীদের ভার্চুয়াল অধিবেশনে এক শিক্ষার্থী প্রশ্ন করে, যারা খোদা তা'লাকে মানে না তাদেরকে বুঝানোর জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী বা দৃঢ় দলিল কী?

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, 'আসল বিষয় হল, যারা খোদা তা'লাকে মানে না তারা কথাও শুনতে চায় না। খোদা তা'লার অস্তিত্বের সবচেয়ে মজবুত ও সুদৃঢ় প্রমাণ হল, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা যে বলো খোদা নেই; আমি বলছি খোদা আছেন। আমি খোদার কাছে চেয়েছি আর তিনি আমাকে (প্রার্থিত জিনিস) দিয়েছেন। আপনার কোন না কোন দোয়া তো কবুল হয়েছে, না-কি? আপনি দোয়া করেছেন আর আপনার দোয়া কবুল হয়েছে, না হয় নি? (শিক্ষার্থীরা বলে, জ্বি, জ্বি কবুল হয়েছে)। অতএব, যারা খোদাকে মানে না তাদেরকে বলুন, তোমরা যে বলো খোদা নেই, অথচ আমি তাঁর কাছে চেয়েছি আর তিনি আমাকে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার তো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। তাহলে আমি কীভাবে বলবো যে, খোদা নেই? কাজেই, তোমরাও যদি চেষ্টা করো তাহলে তোমরাও আল্লাহ্‌কে পাবে। কিন্তু এরা, যারা খোদাকে মানে না এরা খুবই কট্টরপন্থী। এখানেও একজন Atheist বা নাস্তিক আছে, যার নাম Richard Dawkins। সেও খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। আর সে খোদা তা'লার বিরুদ্ধে বইও লিখেছে। আমি তাকে Five volume commentary, ইসলামী নীতি দর্শন এবং অন্যান্য বইপুস্তকও প্রেরণ করেছি। আমি তাকে বলেছি, এগুলো পাঠ করে তারপর আমাদের সাথে কথা বলো। তুমি বুঝতে পারবে খোদা কী এবং খোদা সম্পর্কিত বিশ্বাসই বা কী? সে বলে, আমি কিছুই পড়বো না। শুধু তোমরাই আমার বই পড়ো, আমি তোমাদের বই-পুস্তক পড়বো না। কাজেই, এরা খুবই একগুঁয়ে হয়ে থাকে। আর যে একগুঁয়ে স্বভাবের, সে কোনভাবেই মানবে না। তবে, যে কিছুটা হলেও পুণ্যস্বভাবী, তার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলো, এরপর তাকে ব্যক্তিগত সম্পর্কের রেশ ধরে খোদা তা'লার নিকটে নিয়ে আসো। অনেক সময় ঘনিষ্টরাও (নিজের) প্রভাব বিস্তার করে এবং অন্য মানুষের জন্য পরিবর্তনের কারণ হয়ে যায়। কাজেই, এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই হল সবচেয়ে বেশি কার্যকর। এখানে অনেক সময় আমার কাছেও স্বাক্ষাৎপ্রার্থীরা, সংবাদমাধ্যমের বিভিন্ন লোকজন আসে। পরবর্তীতে (তাদের) অনেকে

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: **Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)**

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 4 July, 2024 Issue No.27

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

বলেছে যে, আমরা খোদাকে মানি না ঠিকই, কিন্তু কখনও যদি খোদাকে মানি তাহলে আমরা তোমাদের খলীফার কারণে মানবো কেননা, তিনি আমাদেরকে খোদা তা'লা সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিয়েছেন।' এছাড়া মানুষের হৃদয় কোমল হওয়ার জন্য দোয়াও করা উচিত, যাতে খোদা তা'লা হৃদয়কে নরম করে দেন। কাজেই, নিজের ব্যক্তিগত আদর্শ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তা প্রদর্শন করো এবং দোয়া কবুল হওয়া সংক্রান্ত নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো। সবচেয়ে বড় কথা হল, তোমার সাথে আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহার কীরূপ? নিজের সাথে আল্লাহ্‌র ব্যবহারের কথা যখন বলবে তখন তোমার সেই প্রাথমিক অভিজ্ঞতায় মানুষ অনেক বেশি অনুপ্রাণিত হবে। এছাড়া অগণিত দলিলপ্রমাণ আছে। "হামারা খোদা" ও "হাস্তিয়ে বারী তা'লা কে দাস দালায়েল" আছে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর পুস্তক "হাস্তিয়ে বারী তা'লা" আছে। এসব বই উর্দুতেও আছে আর এখন ইংরেজিতেও সহজলভ্য। এগুলো পাঠ করো আর তাদেরকেও এগুলো পড়তে দাও। একইভাবে যদি কোন মানুষ শিক্ষিত হয় এবং সে পড়তে পারে তাহলে তাকে প্রথমে 'ইসলামী নীতি দর্শন' বইটি দেওয়া উচিত। এরপর "হাস্তিয়ে বারী তা'লা কে দাস দালায়েল" বইটি দেওয়া উচিত। এগুলো ছোট-ছোট পুস্তিকা। এরপর রয়েছে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর Revealation Rationality Knowladge and truth পুস্তকটি, এর একটি অধ্যায় রয়েছে, খোদা তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে, এটিও অনেককে গভীরভাবে আপ্লুত করে। "হামারা খোদা" পুস্তিকাটিরও ইংরেজি অনুবাদ হয়ে গেছে, এটি পড়তে দেওয়া উচিত। এবার এসব বই-পুস্তক পাঠ করার পরও যদি কেউ না মানে তাহলে আমাদের দায়িত্ব তো শুধু বার্তা পৌঁছে দেওয়া। কারও হেদায়েত বা সুপথ লাভের জন্য আমরা কোন গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা দিতে পারি না। হেদায়েত দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'লা নিজের হাতে রেখেছেন। আমাদের প্রতি শুধু তবলীগ বা প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, আমরা যেন তবলীগ করি এবং আল্লাহ্ তা'লার পথের দিকে (মানুষকে) নিয়ে আসি।

প্রশ্ন: এই একই সাক্ষাতানুষ্ঠান আরেকজন শিক্ষার্থী জানতে চায়, 'আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম কী?' এর প্রশ্নের উত্তরে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, দআল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করো। আল্লাহ্ তা'লা বলে দিয়েছেন, আমি মানুষকে আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি। 'ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লেইয়া'বুদূন' (সূরা আয্ যারিয়াত: ৫৭)। আর নিজের জন্মের যে মূল উদ্দেশ্য তা যথাযথভাবে পূর্ণ করো। প্রথম যে কথা আল্লাহ্ বলেছেন তা হল, ঈমান বিল্ গায়েব বা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনয়ন। ঈমান বিল্ গায়েবের পর আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, 'ইউকীমূনাস সালাতা' অর্থাৎ নামায প্রতিষ্ঠা করো। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ হল, নামায প্রতিষ্ঠা করো। কাজেই দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ইবাদত। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ঈমান আনার পর নামায পড়া। এরপর মহানবী (সা.) বলেছেন, নামাযের মধ্যে মানুষ যখন সেজদায় পতিত থাকে তখন সে আল্লাহ্ তা'লার সবচেয়ে নিকটে থাকে। তাই সেজদায় আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করো যাতে তিনি আমাদেরকে তাঁর নৈকট্য প্রদান করেন। 'জো তুম সে মাঙ্গাতা হু ওহ্ দওলাত তুমহী তো হো' অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাকে বলো, (হে খোদা) আমি তোমার কাছে যে সম্পদ যাচনা করছি তা তো তুমিই। আমার অর্থকড়ি চাই না। আমি পার্থিব জগৎ চাই না। আমি শুধু তোমার নৈকট্য লাভ করতে চাই। আর তোমার নৈকট্য লাভ হলে পার্থিব ধনসম্পদও আমার দাসী হয়ে যাবে, আমার অনুগত চাকর হয়ে যাবে এবং জাগতিক সকল সুযোগ-সুবিধাও আমার ভৃত্য বনে যাবে। আর আমার আধ্যাত্মিকতাও উন্নতি লাভ করবে। তাই সেজদায় বেশি বেশি দোয়া করো, যাতে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় নৈকট্যে ভূষিত করেন। ঠিক আছে?

প্রশ্ন:এই ৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের ভার্চুয়াল অধিবেশনেই আরেকজন শিক্ষার্থী হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে জানতে চায় যে, 'নামাযে স্বাদ বা আনন্দ লাভের উপায় কী?'

এর উত্তরে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, 'স্বাদ বা আনন্দ লাভের উপায় কী? এর একটি সহজ রীতি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলে দিয়েছেন যে, (নামাযের মধ্যে) 'তুমি কান্নার ভান করো'। মানুষ যখন বাহ্যিকভাবে কোন বিষয়ে ভান করে তখন সে নিজের মাঝে যে অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করে তার হৃদয়ের অনুভূতিগুলোও তদ্রূপ হতে আরম্ভ করে। সূরা ফাতিহা পাঠ করতে থাকলে

'ইয়্যাকানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈন' বার বার পাঠ করতে থাকো এবং এর প্রতি অভিনিবেশ করো আর কান্নার চেষ্টা করতে থাকো। তাহলে এক পর্যায়ে তোমার কান্না এসে যাবে। যখন তোমার কান্না পাবে, হৃদয়ে যখন ভাবাবেগ সৃষ্টি হবে, কোমলতা সৃষ্টি হবে তখন তুমি এতে আনন্দ পেতে আরম্ভ করবে বা একে উপভোগ করতে শুরু করবে। এরপর যখন তুমি রুকুতে গিয়ে দোয়া পড়বে তখন তুমি (নামাযের) স্বাদ উপভোগ করবে। তারপর যখন সামিয়াল্লাহ্ বলবে তখন তুমি আনন্দ উপভোগ করবে। সেজদায় গিয়ে উদ্বেগাকুল হলে আনন্দ উপভোগ করবে। কাজেই নিজের মাঝে এই অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে। এক সংগ্রাম ও চেষ্টা-সাধনায় এটি অর্জিত হয়। চেষ্টা-প্রচেষ্টা করলে আনন্দ পেতে আরম্ভ করবে। আর একবার আনন্দ পেতে আরম্ভ করলে এটি তুমি উপভোগ করবে। প্রত্যেকবারই তুমি আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিত হয়ে নামাযে আহাজারি করার চেষ্টা করবে যাতে তুমি স্বাদ উপভোগ করতে পারো, আনন্দ লাভ করতে পারো। সেজদায় আল্লাহ্‌র সমীপে কান্নায় যে আনন্দ পাওয়া যায় তা সকল আনন্দের চেয়ে বেশি উপভোগ্য। ঠিক আছে? আর আল্লাহ্‌র কাছে এই দোয়া করো, যে অঙ্গীকার নিয়ে তুমি জামেয়ায় এসেছ, আল্লাহ্ তা'লা যেন (তোমাকে) সেই অঙ্গীকার রক্ষার এবং পালনের তৌফিক দেন। আর তুমি একজন উত্তম মুরব্বী ও মোবাল্লেগ হয়ে বের হও এবং স্বজাতির মাঝে তবলীগ করে সেই জাতিকে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে সমর্পণকারী বানাতে সক্ষম হও। এরপর তাদের মধ্যেও যেন এমন মানুষ জন্ম নেয় যারা ইবাদতে আনন্দ উপভোগ করবে।

(খুতবার শেষাংশ...)

থাকতেন। আগবাড়িয়ে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণের চেষ্টা থাকত না। মোটকথা একটিই ধ্যানজ্ঞান ছিল আর তা হলো, যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে যে কাজ আমার ওপর অর্পণ করা হয়েছে সেটি উত্তমভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করব। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করুন এবং উন্নত মর্যাদায় ভূষিত করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হলো কেরালা নিবাসী মুকাররম আব্দুর রহমান কোটি আলা নূর সাহেবের। তিনিও কিছুদিন পূর্বে মৃত্যু বরণ করেন, **'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।** আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি মূসী ছিলেন। ষোলো বছর বয়সে তিনি আপন মামা মওলানা মুহাম্মদ আলভী সাহেবের মাধ্যমে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। নামায-রোযায় নিয়মিত, জামা'তের সাথে অত্যন্ত নিষ্ঠার সম্পর্ক রাখতেন, সরল হৃদয়ের, বিনয়ী এবং পুণ্যবান মানুষ ছিলেন। সর্বদা তার এই প্রচেষ্টাই থাকত যে, প্রতিটি কাজে কোনো না কোনো ধর্মীয় দিক অন্তর্ভুক্ত করতেন।

তার ছেলে লিখেন, তিনি আমাদের তরবিয়তের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিষয়কে প্রাধান্য দিতেন। এছাড়া সকালে স্কুলে যাওয়ার পূর্বে এক-দুই ঘণ্টার জন্য ধর্মীয় মাদ্রাসায় পাঠাতেন এবং রাতে শোবার পূর্বে নিয়মিত কুরআন করীম তিলাওয়াত করাতেন।

তার স্ত্রী তিন বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। উত্তরসূরীদের মাঝে দুই কন্যা এবং চার পুত্র রয়েছে। একজন পুত্র শামসউদ্দীন মালাবারী সাহেব কাবাবীর জামা'তের মুবাল্লিগ ইনচার্জ হিসাবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করছে- যে জানাযাতে উপস্থিত হতে পারেনি। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও ধৈর্য ও মনোবল দান করুন, মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন, ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন। (আমীন)

****

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir